গীত-উপক্রমণিকা

শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা



গীত-উপক্রমণিকা

প্রথম খণ্ড

সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-বিশারদ রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা



প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০-২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

কলিকাতা
১২০-২, আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অজিতকে দিলাম

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন শর্ম্মা আমাকে তাঁহার গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ ভাবে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার ভূমিকা লেখা সহজ নহে। তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু সঙ্গীতের ব্যবহারিক দিকটা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই। ইহার ঔপপত্তিক দিকও তিনি যথেষ্ট শ্রম সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত আনন্দের প্রস্রবণ। কেহ গান গাহিয়া বা কোনও যন্ত্র বাজাইয়া আনন্দ দান করিতে পারেন; কেহ তাহা শুনিয়া সুখী। সঙ্গীতের এই আনন্দ-সৃষ্টির দিক চিন্তা করিয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহার সম্বন্ধে জানিবার, বুঝিবার বা আলোচনা করিবার কিছু আছে। বস্তুতঃ একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আনন্দসৃষ্টি সহজসাধ্য নহে। একটি ফুল দেখিলে বা শিশুর আধ আধ কথা শুনিলে হৃদয়ে সহজেই একটি আনন্দের স্পন্দন উত্থিত হয়। কিন্তু এই স্বভাবজাত আনন্দ চিরদিন মানবের হৃদয়ে তৃপ্তিদান করিতে পারে কি? সেই জন্য নানাবিধ শিল্পকলার আবির্ভাব। আমরা আনন্দ খুঁজিতে গিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে বাধ্য হই। ইহারই ফলে নানা কারুকার্য্য বিচিত্র চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীতের বহুবিধ রূপ জন্মলাভ করিয়াছে। মানুষের আবিষ্কার-প্রয়াস যেমন তাহাকে হিমালয়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে টানিতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গীত ও শিল্প-সাধনা উচ্চ হইতে উচ্চতর অভিব্যক্তির দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে। সর্ব্বদেশেই সঙ্গীতের নূতন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত উভয়ই দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিগত দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে বালক-বালিকাদিগের বিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত সঙ্গীতের এত প্রসার বাড়িয়াছে যে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশে সব জিনিষই কিছু ধীরে ধীরে হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের বিরাট রথের মত আমাদের মনোরথও ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। তবে সুখের বিষয় এই যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের দেশেও একটু সজাগ অনুসন্ধানের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে আমাদের সমাজে বীণাবাদিনী সরস্বতী দেবীর একটি শুভ্র অমল কমলাসন পড়িয়াছে। সঙ্গীতের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সঙ্কোচ বা সলজ্জ ভাব ছিল, তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া আসিতেছে। অনেক পরিবারে ছেলে-

মেয়েদের রীতিমত গান শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত পরীক্ষণীয় বিষয়-তালিকার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। যে-সকল বিদ্যালয় সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ তাহাদের ছাত্রদিগের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি সেগুলির অধ্যাপনা সৌকর্য্যার্থ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীত কতখানি আদর লাভ করিয়াছে।

গত বৎসর শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গীতজ্ঞগণের এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ বৈঠকে উচ্চ ও মধ্যবিদ্যালয়-(secondary school) সমূহে সঙ্গীত শিক্ষার প্রবর্ত্তন কল্পে কি ব্যবস্থা করা যায় তাহার সম্যক আলোচনা হইয়াছিল। যাঁহারা আহুত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম। তাঁহাদের আলোচনার ফল লিপিবদ্ধ হইয়া পুস্তিকাকারে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাববশতঃ উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তাহা হইলেও শিক্ষা বিভাগ যে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বালক-বালিকার জীবনে সঙ্গীত শিক্ষা যে কি পরিমাণে আনন্দোপধায়ক তাহা স্বীকার করিয়াছেন ইহাই একটি সুন্দর সংবাদ।

এইরূপে চারিদিক হইতে যখন অনুকূল পবন প্রবাহিত তখন 'গীত-উপক্রমণিকা'র মতো একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ যে বিশেষ সময়োপযোগী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গীত-উপক্রমণিকায় সহজ ভাষায় সঙ্গীত সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঙ্গীত একটি শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা; মানবপ্রতিভার অশেষ নিদর্শন ইহাতে আছে। সেই কারণ সুদূর অতীতের পাষাণে বক্ষ চিরিয়া ঝরণার ধারার মত মানবের নীরস হৃদয় ভেদ করিয়া সঙ্গীতের কলনাদিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়াছিল, আর তার পরে মানব কত কুসুমকানন, বেতসকুঞ্জ, রসালবীথিকা তার তীরে তীরে সাজাইয়া শোভায় চূড়ান্ত বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। সঙ্গীতের এই শোভা বা কারুকার্য্যই তাহার সম্পদ। গীত-উপক্রমণিকায় নানা দিক হইতে সঙ্গীতকলার মাধুর্য্য বা বৈচিত্র্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হারমোনিয়ম ও তানপুরা সহযোগে সুরসাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গীতের 'ভাব' পর্য্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। মাত্রা সম্বন্ধে ঠাট, গীতছন্দ তাল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার

নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে গীত অভ্যাস করিলে অনেকে সুফল লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমি বিশ্বাস করি। তিনি সঙ্গীতের একটুখানি ইতিহাসও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সংযোজিত করায় ইহার মূল্য প্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার মনে হয় ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীতও এই পুস্তকের সাহায্যে সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইবে। ইতি—

১০নং ডভার লেন
১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৮

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ ১—৭

সপ্তস্বর :

সঙ্গীতশাস্ত্র
তৈর্য্যত্রিক
ঔপপত্তিকসিদ্ধ ও ক্রিয়াসিদ্ধ
সপ্তস্বরপরিচয়
সপ্তক
উদারা, মুদারা ও তারা

স্বর-অন্তর
পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তর
স্বরগ্রাম
পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তরের চিহ্ন
বিকৃত স্বর
কড়ি-কোমল
কড়ি কোমলের চিহ্ন
আরোহণ ও অবরোহণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৭—১১

হারমোনিয়মে স্বর-পরিচয় :

হারমোনিয়ম-পরিচয়
কি কি কারণে হারমোনিয়ম নষ্ট হয়
হারমোনিয়মে স্বর-পরিচয়
হারমোনিয়মে সহজে স্বর চিনিয়া লইবার উপায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১২—১৫

মাত্রা-প্রকরণ :

মাত্রা কি ?
মাত্রার গতি
মাত্রাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই কেন ?
মাত্রার চিহ্ন
মাত্রার জ্ঞান জন্মাইবার সহজ উপায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৬—২০

কণ্ঠমার্জ্জন :

কণ্ঠমার্জ্জন আবশ্যক কেন ?
স্বর কর্কশ হয় কেন ?
কি করিলে স্বর মধুর হয় ?
কণ্ঠসাধনা
কণ্ঠের অনিষ্টকর বিষয় কি কি ?
গলায় বয়সা ধরা
কণ্ঠমার্জ্জনা সম্বন্ধে ভ্রম ধারণা
মুদ্রাদোষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২০—২৮

স্বর ও মাত্রাসাধন :

স্বর-সাধনপ্রণালী
প্রথম পাঠ
দ্বিতীয় পাঠ
তৃতীয় পাঠ
চতুর্থ পাঠ (কড়ি-কোমল সাধন)
স্বরবিন্যাস
রাগ-রাগিণী কি ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৯—৩২

খরজ পরিবর্ত্তন :

খরজ কি ?
খরজ পরিবর্ত্তন কি ?
খরজ পরিবর্ত্তনকৌশল ?
খরজ পরিবর্ত্তনের তালিকা
শুদ্ধ স্বরের খরজ পরিবর্ত্তন
বিকৃত স্বরের খরজ পরিবর্ত্তন

সপ্তম পরিচ্ছেদ — ৩৩—৩৮

গীত-অলঙ্কার ঃ

আশ
মীড়
মীড়সাধন
কম্পন
গিট্‌কারী
ভূষিকা
স্বরের বলসাধন
প্রস্বন
অক্ষেপ ও বিক্ষেপ
ঝাঁট
তান
গমক
উপজ ও কর্ত্তব
মূর্চ্ছনা

অষ্টম পরিচ্ছেদ — ৩৯—৪৫

গীতছন্দ ঃ

ছন্দের রূপ
সমপদী ও বিষমপদী
ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দ

নবম পরিচ্ছেদ — ৪৬—৫২

তাল-প্রকরণ ঃ

তাল কি ?
চরণ ও আওয়ার্দা
শম্, ফাঁক, তালি ইত্যাদির চিহ্ন
সঙ্গত ও তালের ঠেকা
বোল বা বাণী
ত্রিমাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত তাল
দাদ্‌রা

ভরতঙ্গা
খেম্‌টা
আড়-খেম্‌টা
একতালা
চৌতাল
চতুর্মাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত তাল
কার্ফা
ঠুংরী
কাওয়ালী
যৎ
ঢিমা তেতালা
পটতাল
আড়াঠেকা
মধ্যমান
বিষমপদী ছন্দের অন্তর্গত তাল
তেওরা
রূপক
পোস্তা
ঝাঁপতাল
সুরফাক্তা
যৎ
তেওট
ধামার
আড়া-চৌতাল
তাল ও সুরজ্ঞান জন্মাইবার সহজ উপায়

দশম পরিচ্ছেদ ৫৩—৬৬

প্রচলিত স্বরলিপির ব্যাখ্যা ঃ
গীতের চারি কলি বা তুক
দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির পরিচয়
আকারমাত্রিক স্বরলিপির পরিচয়
বিসর্গমাত্রিক স্বরলিপির পদ্ধতি
সারগম

গীত-উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সপ্তস্বর

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু শিখিতে হইলে প্রথমেই সঙ্গীতশাস্ত্র কি তাহা জানিয়া রাখা উচিত। সঙ্গীত বলিতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিকে বুঝায়। "গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।" অতএব যে শাস্ত্রে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি বিষয় বিশদভাবে লেখা আছে তাহাই সঙ্গীতশাস্ত্র।

সঙ্গীতশাস্ত্র

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সঙ্গীতের তিনটি কাণ্ড। গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড। এই তিনটি কাণ্ডকে এককথায় বুঝাইতে হইলে তাহাকে তৌর্য্যত্রিক বলে। সঙ্গীতের অপর নামই তৌর্য্যত্রিক।

তৌর্য্যত্রিক

সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যাঁহারা সঙ্গীতে জ্ঞান অর্জ্জন করেন তাঁহাদিগকে ঔপপত্তিকসিদ্ধ বলে। আর যিনি গান করিয়া, বাদন করিয়া বা নৃত্য করিয়া সঙ্গীতে দক্ষ হন তাঁহাকে ক্রিয়াসিদ্ধ বলে। ইংরেজীতে ঔপপত্তিকসিদ্ধকে theoretical ও ক্রিয়াসিদ্ধকে practical বলা হয়।

ঔপপত্তিক-সিদ্ধ ও ক্রিয়াসিদ্ধ

বাংলা ভাষা শিখিতে হইলে প্রথমে যেমন অ, আ, ক, খ, বা ইংরেজী ভাষা শিখিতে হইলে A, B, C, D প্রভৃতি বর্ণগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হয়, সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলেও তেমনি স, ঋ, গ, ম, প, ধ ও নি এই সাতটি সুরকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হয়। লাল, নীল, পীত, সবুজ প্রভৃতি সাতটি রং লইয়াই যেমন চিত্রশিল্প, সেইরূপ সাতটি সুর লইয়াই আমাদের সঙ্গীত। এই সাতটি সুরের প্রকৃত নাম—ষড়্‌জ, ঋষভ,

সপ্তস্বর-পরিচয়

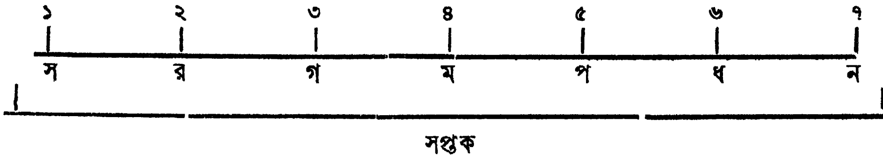
গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ইহাদের আদ্যক্ষর লইয়াই স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি হইয়াছে। চলিত কথায় সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়। সুরগুলিকে লিখিতে স, র, গ, ম, প, ধ, ন এইরূপ লিখিব।

এই সুরগুলি যথাক্রমে একটি হইতে অপরটি উচ্চ বা চড়া। যেমনঃ—'স' সুর হইতে 'র' সুর চড়া; 'র' হইতে 'গ' চড়া; 'গ' হইতে 'ম' চড়া; 'ম' হইতে 'প' চড়া; 'প' হইতে 'ধ' চড়া; 'ধ' হইতে 'ন' চড়া।

'ন' সুরের পরও উচ্চ সুর অনেক আছে। 'ন' সুরের পর এমন একটা চড়া সুর পাওয়া যায় যাহা 'স' সুরের সঙ্গে অবিকল মিশিয়া যায়। অর্থাৎ দুইটি সুর এক সঙ্গে বাজিতে থাকিলে দুইটি সুর যে একসঙ্গে বাজিতেছে তাহা টের পাওয়া যায় না; মনে হয় যেন একই সুর বাজিতেছে। সুতরাং সেই সুরটির নাম চড়া 'স'। এই চড়া 'স' সুর হইতে চড়া 'র', চড়া 'গ' 'ম', 'প', 'ধ', 'ন' উচ্চসুর পাওয়া যায়। 'স' সুর ও চড়া 'স' সুর একসঙ্গে বাজিলে যেমন এক সুরে মিশিয়া যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সুর যে একসঙ্গে বাজিতেছে এইরূপ মনে হয় না, 'র' ও চড়া 'র' সুর দুইটিও এক সঙ্গে বাজিলে এক সুরে মিশিয়া যায়। এইরূপ 'গ' ও চড়া 'গ', 'ম' ও চড়া 'ম', 'প' ও চড়া 'প', 'ধ' ও চড়া 'ধ', 'ন' ও চড়া 'ন' একত্র বাজিলে এক সুরে মিশিয়া যায়।

'স' সুরের নিম্ন বা খাদ সুরও আছে। 'স' সুরের পর এমন একটা সুর পাওয়া যায় যাহা 'ন' সুরের সঙ্গে এক সুরে মিশিয়া যায়। সুতরাং ইহার নাম খাদ 'ন'। খাদ 'ন' সুরের পর খাদ 'ধ', 'প', 'ম', 'গ', 'র' ও 'স' সুর যথাক্রমে পাওয়া যায়। 'ন' সুর ও খাদ 'ন' সুর যেমন এক সুরে মিশিয়া যায়, 'ধ' ও খাদ 'ধ', 'প' ও খাদ 'প', 'ম' ও খাদ 'ম', 'গ' ও খাদ 'গ', 'র' ও খাদ 'র', এবং 'স' ও খাদ 'স' একত্র বাজিলে একসুরে অবিকল মিশিয়া যায়।

স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি সুর এককথায় বুঝায় বলিয়া তাহাকে
সপ্তক সপ্তক বলে।



সপ্তক

উদারা, মুদারা ও তারা

অতি-খাদ সুর হইতে অতি-চড়া সুর মধ্যে এইরূপ অনেক সপ্তক পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিনটি সপ্তক আমাদের গীতে ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি সপ্তকের মধ্যে একটি খাদ-সপ্তক, একটি মধ্য-সপ্তক ও একটি চড়া—সপ্তক। খাদ-সপ্তকের নাম উদারা, মধ্য-সপ্তকের নাম মুদারা ও চড়া-সপ্তকের নাম তারা।

এই তিনটি সপ্তকের সুরগুলি লিখিতে উদারার সুরের নীচে বিন্দু (.) ও তারার সুরগুলির উপরে বিন্দু ব্যবহার করিব। কাজেই মুদারার সুরগুলির আর পৃথক চিহ্ন না দিলেও চলিবে। যেমন ঃ—

স র গ ম প ধ ন স র গ ম প ধ ন স র র গ ম প ন

মুদারা তারা

উদারা

অষ্টক

'স' হইতে চড়া 'স' পর্য্যন্ত আটটি সুরকে এককথায় বুঝাইতে হইলে অষ্টক বলা হয়। ইংরেজী ভাষায় অষ্টককে অক্টেভ (octave) বলে।



স্বর-অন্তর*

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স, র, গ, ম প্রভৃতি সুর একটি হইতে আর একটি চড়া। কিন্তু কতটুকু চড়া বলা হয় নাই, এইবার তাহা বলিব।

*প্রথম শিক্ষার্থীকে সহজে বুঝাইবার জন্য এখানে হারমোনিয়মের keyboard অনুযায়ী স্বর-অন্তর দেওয়া হইল। শ্রুতিহিসাবে স্বর-অন্তর পরে অন্য পরিচ্ছেদে লেখা হইয়াছে।

'স' হইতে 'র' চড়া, 'র' হইতে 'গ' চড়া, 'গ' হইতে 'ম' চড়া এইরূপ সুরের চড়াকে স্বর-অন্তর বলা হয়।

'স' হইতে 'র' সুরের অন্তর যতটুকু, 'র' হইতে 'গ' সুরের অন্তরও ততটুকু। কিন্তু 'গ' হইতে 'ম' সুরের অন্তর ততটুকু নয়। 'স' হইতে 'র' সুরের অন্তর যত, 'গ' হইতে 'ম'-এর অন্তর তার অর্দ্ধেক। আবার 'ম' হইতে 'প' সুরের অন্তর, 'প' হইতে 'ধ' সুরের অন্তর, 'ধ' হইতে 'ন' সুরের অন্তর, 'র' হইতে 'র' সুরের অন্তরের সমান। কিন্তু 'ন' হইতে চড়া 'স' সুরের অন্তর 'গ' হইতে 'ম' সুরের অন্তরের সমান এবং 'স' হইতে 'র' সুরের অন্তরের অর্দ্ধেক।

যদি 'স' হইতে 'র' অন্তরকে ১ ধরা যায় তবে 'র' হইতে 'গ' সুরের অন্তরও ১ হইবে। কিন্তু 'গ' হইতে 'ম' সুরের অন্তর ½ হইবে। আবার 'ম' হইতে 'প', 'প' হইতে 'ধ' ও ধ হইতে 'ন' সুরের অন্তর পরস্পর 'স' হইতে 'র' সুরের অন্তরের সমান, অতএব ১ অন্তর হইবে। 'ন' হইতে 'স' সুরের অন্তর 'গ' হইতে 'ম' সুরের অন্তরের সমান, কাজেই অন্তর-সংখ্যা ½ হইবে।

পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তর

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমরা দুই প্রকার অন্তর পাইতেছি; একটি এক-অন্তরবিশিষ্ট ও অন্যটি অর্দ্ধ-অন্তরবিশিষ্ট। এই এক-অন্তরবিশিষ্টকে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধ-অন্তরবিশিষ্টকে অর্দ্ধান্তর বলা হয়।

'স'	হইতে	'র'	পূর্ণান্তর
'র'	,,	'গ'	
'ম'	,,	'প'	
'প'	,,	'ধ'	
'ধ'	,,	'ন'	
'গ'	হইতে	'ম'	অর্দ্ধান্তর
'ন'	,, চড়া	'স'	

স্বরগ্রাম

এইরূপ অন্তরবিশিষ্ট সজ্জিত অষ্টককে স্বরগ্রাম বলা হয়

পূর্ণান্তরের বিয়োগ চিহ্ন (–) ও অর্দ্ধান্তরের যোগ চিহ্ন (+) ব্যবহার করিব। যেমন ঃ— পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তরের চিহ্ন

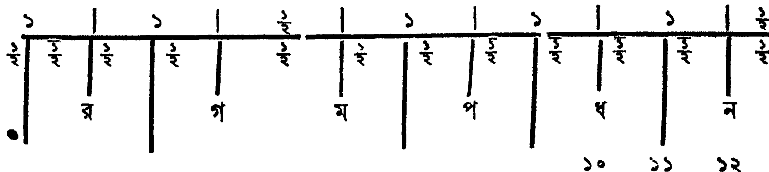
| ˎ | ১ | ˎ | ˎ | ˎ | ১ |

স – র – গ + ম – প – ধ – ন + স

আমরা স্বরগ্রামে দুইটি অর্দ্ধান্তর সুর পাইতেছি। আর সবগুলিই পূর্ণান্তর। পূর্ণান্তর সুরগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধান্তরবিশিষ্ট কয়েকটি সুর পাওয়া যায়। যেমন 'স' হইতে 'র' পূর্ণান্তর। 'স' হইতে অর্দ্ধান্তর উচ্চ ও 'র' হইতে অর্দ্ধান্তর নিম্ন আর একটি সুর পাইতে পারি। কারণ আমাদের স্বরগ্রামেও অর্দ্ধান্তর সুর আছে দেখিয়াছি। অতএব পূর্ণান্তরকে অর্দ্ধান্তর করিলেও কয়েকটা সুর পাইব। 'র' হইতে 'স' সুরের মধ্যে একটা সুর পাইব। কারণ তাহা পূর্ণান্তর। কিন্তু 'গ' হইতে 'ম' সুরের মধ্যে আর সুর আমরা পাইতে পারি না। যেহেতু তাহা স্বভাবতই অর্দ্ধান্তর।। 'ম' হইতে 'প'-এর মধ্যে, 'প' হইতে 'ধ'-এর মধ্যে, 'ধ' হইতে 'ন'-এর মধ্যে এক-একটা সুর পাইব, ইহারা পূর্ণান্তর। আবার 'ন' হইতে 'র্স'-এর মধ্যে আর সুর পাইব না। কারণ ইহা অর্দ্ধান্তর। বিকৃত সুর

যাহা হউক এইরূপ সুর আমরা পাঁচটি পাইতেছি। ইহাদিগকে বিকৃত সুর বলে। বিকৃত সুর সর্ব্বদাই সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। এক-এক সপ্তকে বা অষ্টকে পাঁচটি বিকৃত সুর আছে। সাতটি শুদ্ধ সুর ও পাঁচটি বিকৃত সুর, মোট বারটি সুর এক-এক সপ্তকে আমরা পাই। চিত্রে তাহা দেখাইতেছি।

অষ্টম



সপ্তক

কড়ি-কোমল যে পাঁচটি বিকৃত সুর পাওয়া গেল, শুদ্ধ সুরগুলির মত তাহাদেরও এক-একটা নাম আছে, নামগুলির কথাই এখন বলিতেছি।

'স' হইতে উচ্চ ও 'র' হইতে নিম্ন যে সুর পাওয়া গেল তাহাকে 'স' সুরের কড়ি ও 'র' সুরের কোমল বলা হয়। তবে 'স' কড়ি নাম ব্যবহার করা হয় না, 'র' কোমল বলা হয়। সেইরূপ 'র' হইতে 'গ' সুরের মধ্যবর্ত্তী যে সুর তাহার নাম 'র' কড়ি বা 'গ' কোমল। এখানেও 'র' কড়ি নাম সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় না। 'গ' কোমলই বলা হইয়া থাকে। 'ম' হইতে 'প' সুরের মধ্যবর্ত্তী সুরের নাম 'ম' কড়ি বা 'প' কোমল। এখানে আবার 'ম' কড়িই বলা হয়। 'প' কোমল নাম ব্যবহৃত হয় না। 'প' হইতে 'ধ' সুরের মধ্যবর্ত্তী সুরকে 'ধ' কোমলই বলা হয়। 'প' কড়ি বলা হয় না। 'ধ' হইতে 'ন' সুরের মধ্যবর্ত্তী সুরের নাম 'ধ' কড়ি বা 'ন' কোমল। 'ধ' কড়ি নাম সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় না। 'ন' কোমল সুরই বলা হয়। অতএব পাঁচটি বিকৃত সুরের নাম যথাক্রমে কোমল 'র', কোমল 'গ', কড়ি 'ম', কোমল 'ধ', ও কোমল 'ন'।

* কোমল সুরের চিহ্ন ওকার (ে া), আর কড়ি সুরের চিহ্ন ঈকার (ী) যথা ঃ—

রো = কোমল র
গো = কোমল গ
মী = কড়ি ম
ধো = কোমল ধ
নো = কোমল ন

| ১ | ১ | ১/২ | ১ | ১ | ১ | ১/২ |

স রো র গো গ ম মী প ধো ধ নো ন সঁ

* এই পুস্তকে সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় প্রবর্ত্তিত বিসর্গ মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

কোন খাদস্বুর হইতে ক্রমে উচ্চ স্বুরে গীত বা বাদন করিয়া যাওয়ার নাম আরোহণ ও কোন উচ্চ স্বুর হইতে ক্রমে নিম্ন স্বুরে গীত বা বাদন করিয়া যাওয়ার নাম অবরোহণ। যথা ঃ— আরোহণ অবরোহণ

আরোহণ— স-র-গ + ম-গ-ধ-ন + সঁ

অবরোহণ— সঁ + ন-ধ-প-ম + গ-র-স

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হারমোনিয়মে স্বর-পরিচয়

হারমোনিয়ম প্রথম শিক্ষার্থীকে অতি সত্বর সাধারণ স্বর-পরিচয় করাইয়া দেয়। এস্রাজ, বেহালা, সারেঙ্গী, প্রভৃতি ধনুযন্ত্রগুলিতে (ছড় দিয়া যে-সব যন্ত্র বাজাইতে হয় তাহাদিগকে ধনুযন্ত্র বলে) প্রকৃত স্বরজ্ঞান অতি সত্বর হয়। এই জন্য ধনুযন্ত্রের সাহায্যে স্বরলিপি শিক্ষা করাই উত্তম। কিন্তু যাঁহারা নিজে নিজে অর্থাৎ কোন শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত গীত শিক্ষা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে হারমোনিয়ম সুবিধাজনক। কারণ, ধনুযন্ত্রের পর্দ্দা বা তারগুলি সুশৃঙ্খল করিবার জন্য সূক্ষ্ম স্বরজ্ঞান আছে এমন একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কারণ হঠাৎ একটা তার ছিঁড়িয়া গেলেই গোলমাল হইয়া যায়। কিন্তু হারমোনিয়মে সে ভয় নাই। পর্দ্দা টিপিয়া বেলো (bellow) করিলেই সুর বাহির হয়। এইজন্য প্রথম শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক সুরজ্ঞান জন্মাইবার জন্য হারমোনিয়মের সাহায্য লইবার পরামর্শ দিতেছি। সঙ্গীত শিক্ষকগণ যেন ধনুযন্ত্রের সাহায্যে স্বর শিক্ষা দেন।

যাই হউক, হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহার ব্যবহার-কৌশল জানিয়া রাখা উচিত। তাহা না হইলে যন্ত্রটি সহজেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বেশী। এই জন্য হারমোনিয়ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলিতেছি।

হারমোনিয়ম-পরিচয়

হারমোনিয়মের যে কালো ও সাদা পর্দ্দা বা চাবী থাকে তাহাদিগকে এক-কথায় বুঝাইতে ইংরেজীতে কী-বোর্ড (keyboard) বলা হয়। এই চাবীগুলি টিপিলে প্রত্যেকটি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সুর বাহির হয়। চাবীগুলির একপ্রান্ত বাঁকা স্প্রীং (spring) দ্বারা চাপা থাকে। তাহাতে চাবী টিপিয়া ছাড়িয়া দিলেই তাহা পূর্ব্বের স্থানে বসিয়া যায়। চাবীগুলির নীচে একটি কাঠ থাকে। সেই কাঠটিতে প্রত্যেকটি চাবীর নীচে ছিদ্র থাকে। ছিদ্রগুলি উত্তমরূপে বন্ধ রাখিবার জন্য চাবীগুলির নীচে এক এক টুক্‌রা চামড়া লাগান থাকে ও উপরের স্প্রীংগুলি চাবী টিপিয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখে। সেই ছিদ্রগুলিতে এক-একটি পিতলের পাত সংযুক্ত থাকে, তাহাদের নাম রীড্ (reed)। এই রীড্‌গুলি বাতাস লাগিয়া কাঁপিলেই আওয়াজ হয়। চাবীর উপর যে সরু লম্বা কাঠখানি থাকে তাহাকে 'বুকের কাঠ' বলে।

হারমোনিয়মের পাশের দিকে যে কয়েকটি ছিপির মত জিনিষ থাকে, তাহাদিগকে ষ্টপার (stopper) বলে। যন্ত্রটি বাজাইতে হইলে প্রথমেই যে-কোন একটি ষ্টপার টানিয়া লইতে হইবে। এক-একটি ষ্টপার হইতে এক-এক প্রকার আওয়াজ হয়। যেমন, কোনটি হইতে জোর আওয়াজ, কোনটি হইতে মৃদু আওয়াজ বাহির হয়, ডানদিকের শেষ ষ্টপারটি হইতে কম্পনযুক্ত আওয়াজ বাহির হয়। ইহাকে ট্রিমলো (tremolo) বলা হয়। হারমোনিয়মের উপর প্রত্যেকটি ষ্টপারের নীচে এক-একটি ছিদ্র থাকে। ষ্টপার টানিলেই ছিদ্র খুলিয়া যায় ও চাপিলেই ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়।

হারমোনিয়মের পিছন দিকে একটি 'যাঁতা' থাকে। তাহাকে হারমোনিয়মের পিছন দিকে সংলগ্ন করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার নাম বেলো (bellow)। বেলো দ্বারা বাতাস করিতে হয়। কারণ বাতাসের সাহায্য ব্যতীত হারমোনিয়ম বাজিতে পারে না। এই জন্য বারে বারে বেলো চাপিতে হয়। বেলোর নীচে একটি স্প্রীং থাকে। তাহা সব সময়েই বেলোকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া দেয়। তখন ইহার ভিতর বাতাস

যায়। হারমোনিয়মের নীচে বা বেলোর পিছনে কতকগুলি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়াই বেলোর ভিতরে বাতাস যায়। বেলো চাপিলেই ইহার ভিতরের বাতাস অন্য কোন দিকে বাহির হইতে না পারিয়া উপর দিকে আসে ও ষ্টপার খোলা থাকিলে ইহার ভিতরের ছিদ্র দিয়া রীডের নিকট পোঁছায়। তখন চাবি টিপিলেই চাবির নীচের ছিদ্র খুলিয়া যায় ও তথায় সংলগ্ন রীডের ভিতর দিয়া বাতাস জোরে বাহির হয়। তখন বাতাসের জোরে রীড্ কাঁপিয়া আওয়াজ হয়।

হারমোনিয়মের উপরে যে কাঠটি বসান থাকে তাহাকে 'টপ' (top) বলা হয়। আওয়াজ কম-বেশী করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। ইহা উপরে বসান থাকিলে মৃদু ও গোল সুমিষ্ট আওয়াজ বাহির হয় ও তাহা নামাইয়া লইলে জোর আওয়াজ হয়।

কি কি কারণে হারমোনিয়ম নষ্ট হয়

ষ্টপার না খুলিয়া বেলো করিলেই যন্ত্রটি নষ্ট হইবে। কারণ বেলো করিলে যে বাতাস ভিতরে যাইবে তাহা বাহির হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। কিন্তু ষ্টপারের নীচে যে ছিদ্র থাকে তাহাই বাতাস বাহির হইবার একমাত্র পথ। তাহা যদি বন্ধ থাকে তবে বাতাসের জোরে ভিতরের প্রেস-স্প্রীং (press spring) ভাঙিয়া যায় ও রিজরভর (reservoir) ফাটিয়া যায়।

বেলো করিয়া যদি চাবি টেপা না যায় তাহা হইলেও উপরোক্ত জিনিষ দুইটি নষ্ট হইতে পারে। কারণ বেলো করিলেই বাতাস ভিতরে যাইবে ও তাহা ষ্টপারের মধ্য দিয়া উপরে আসিবে। কিন্তু বাহির হইতে না পারিয়া সর্ব্বদা ঠেলিতে থাকিবে। ইহাতে যন্ত্রটির প্যালেট (palette) নামক পদার্থটি ফাটিয়া যাইতে পারে।

অতএব হারমোনিয়ম বাজাইবার পূর্ব্বে ষ্টপার খুলিয়া লইতে হইবে ও বেলো করিলেই চাবি টিপিতে হইবে। এই দুইটি কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে।

'টপ'-এর নীচে ও চাবিগুলির উপরে যে অয়েল ক্লথের টুক্‌রা

থাকে, উহা তুলিয়া হারমোনিয়ম বাজান উচিত নয়। ইহা তুলিয়া লইলে কর্কশ আওয়াজ বাহির হয়। আর সর্ব্বদা তুলিয়া রাখিলে সহজেই ভিতরে ধূলাবালি ঢুকিবে ও তাহাতে যন্ত্রের আওয়াজ ধরিয়া যাইবে। তখন কোন কোন চাবি হইতে 'ঝিন ঝিন' আওয়াজ বাহির হইবে।

হারমোনিয়মের আওয়াজ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ করিয়া তুলিয়া রাখা উচিত নয়। তাহাতে ভিতরে যে উদ্বৃত্ত বাতাসটুকু থাকে, তার জোরে ভিতরের আটা-সংযুক্ত পদার্থগুলি সত্বর পৃথক হইয়া পড়ে। আওয়াজ যতক্ষণ না শেষ হইয়া মিলাইয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চাবি টিপিয়া রাখিতে হইবে ও আওয়াজ নিঃশেষ হইলে পরে ষ্টপার বন্ধ রাখিতে হইবে।

সর্ব্বদা বাজাইলেই হারমোনিয়ম ভাল থাকে। একসঙ্গে অনেক দিন আবদ্ধ থাকিলে ইহার ভিতরে পোকা ঢুকিয়া ভিতরের নরম চামড়াগুলি কাটিয়া দেয়। যন্ত্রটি সর্ব্বদা ঝাড়িয়া মুছিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত।

যদি হারমোনিয়মের বেলো করিয়া চাবি না টিপিতেই 'ঝিন ঝিন' আওয়াজ বাহির হয়, তবে 'বুকের কাঠ' খুলিয়া যে চাবি হইতে আওয়াজ বাহির হইবে সেই চাবিটি তুলিয়া লইতে হইবে। চাবির নীচে যে চামড়া থাকে তাহা ভাল আছে কি-না বা তাহাতে কোন কিছু পড়িয়া ছিদ্রটি বন্ধ হইবার পক্ষে বাধা দিতেছে কি-না দেখিতে হইবে ও পরে পুনরায় তাহা যথাস্থানে রাখিয়া ঐ চাবির উপরের স্প্রীং একটু চাপিয়া দিতে হইবে।

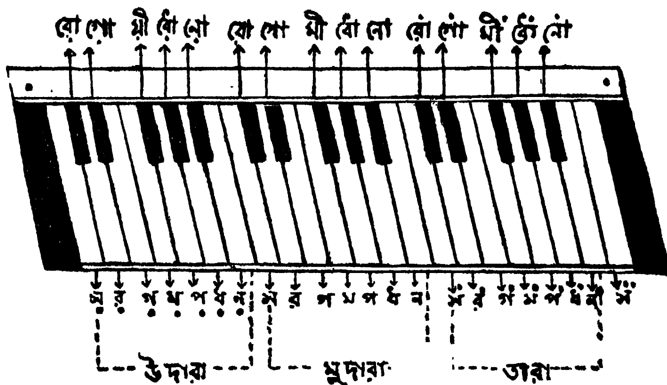
প্রথম পরিচ্ছেদে সাতটি শুদ্ধ স্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

হারমোনিয়মে স্বর-পরিচয়

স রো র গো ম মী প ধো ধ নো ন র্স

এইভাবে আমাদের স্বরগুলি তিন সপ্তকে সজ্জিত। হারমোনিয়মে শুদ্ধ স্বরগুলি সাদা চাবিতে ও বিকৃত স্বরগুলি কালো চাবিতে থাকে।

নীচে হারমোনিয়মের কী-বোর্ডের চিত্র দিয়া উদারা, মুদারা ও তারার সুদ্ধ ও বিকৃত সুরগুলির পরিচয় যথাস্থানে লিখিয়া দিতেছি। চিত্র দেখিলেই সুরগুলির সম্যক পরিচয় হইবে।



হারমোনিয়মে সহজে সুর চিনিয়া লইবার উপায়

'গ' ও 'ম' এবং 'ন' ও চড়া 'স' অর্দ্ধান্তর বলিয়া মাঝখানে আর কোন বিকৃত সুর নাই। এইজন্য দুইটি সাদা চাবির মাঝখানে কোনও কালো চাবি নাই। দুইটি সাদা চাবি একত্র দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটি সুর হয় 'ন' ও 'স', নয় 'গ ও 'ম'। আবার 'স' সুরের ডানদিকে দুইটি কালো চাবি পাশাপাশি আছে। এই কথা দুইটি মনে রাখিলেই আর 'স' সুর বাহির করিতে দেরী হইবে না। 'স' সুর বাহির হইলে অন্যান্য সুর সহজেই বাহির হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাত্রা-প্রকরণ

বাল্যকালে প্রথমেই আমরা হয় শিশু-শিক্ষা, নয় বাল্য-শিক্ষা দেখিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করি ও প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্কগুলি শিখিবার দরকার হয় এবং আমরা ধারাপাত কিনিয়া লই। গীত শিক্ষা কালেও সেইরূপ করিতে হয়। সঙ্গীতেরও বর্ণমালার দিক ও অঙ্কের দিক আছে। সাতটি সুরকেই সঙ্গীতের বর্ণমালা বলা যায়। আর মাত্রা-প্রকরণকে সঙ্গীতের অঙ্কের দিক বলা যায়। সুরের বিষয় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এখন মাত্রা সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতেছি।

মাত্রা কি? গীত বা বাদন করিতে যেটুকু সময়ের দরকার হয় এবং সেই সময়টুকুকে মাপিবার জন্য যে পরিমাণ সময় 'আদর্শ' করিয়া লওয়া হয়, এই আদর্শ পরিমাণ সময়কে মাত্রা বলে। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে সময়ের সূক্ষ্ম খণ্ডকে মাত্রা বলে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। একটা স্থান মাপিতে হইলে আমরা কি করি? যদি এই বইটার দৈর্ঘ্য মাপিতে হয় তবে আমরা (scale) লইব ও মাপিয়া দেখিব কত ইঞ্চি হইল। এখানে স্থান মাপিবার জন্য ইঞ্চিই হইল 'আদর্শ পরিমাণ'। সেইরূপ মাত্রাই সময় মাপিবার আদর্শ পরিমাণ।

ঘড়ির উল্লেখ এখানে করা যায়। কারণ, ঘড়ি সর্ব্বদা সময়কে সূক্ষ্ম সমান সমান অংশে ভাগ করিয়া দিতেছে। ঘড়িতে সেকেণ্ডই সময়ের সূক্ষ্মতম খণ্ড। এই সেকেণ্ডকে আমরা মাত্রা বলিতে পারি।

মাত্রার গতি 'স' সুর এক মাত্রা, 'র' সুর দুই মাত্রা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, 'স' সুর যত সময় ধ্বনিত হইবে 'র' সুর তার দ্বিগুণ সময় ধ্বনিত হইবে। 'স' সুর

যদি এক সেকেণ্ড ধ্বনিত হয় তবে 'র' সুর দুই সেকেণ্ড ধ্বনিত হইবে। 'স' সুর যদি অর্দ্ধ সেকেণ্ড ধ্বনিত হয় তবে 'র' সুর এক সেকেণ্ড ধ্বনিত হইবে। 'স' সুর যদি দুই সেকেণ্ড ধ্বনিত হয়, তবে 'র' সুর চার সেকেণ্ড ধ্বনিত হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে—মাত্রা তিন প্রকারের হয়। অর্দ্ধ সেকেণ্ডকেও এক মাত্রা ধরা যায়, এক সেকেণ্ডকেও এক মাত্রা ধরা যায়, আবার দুই সেকেণ্ডকেও এক মাত্রা ধরা যায়। আমরা বিদ্যালয়ে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্কগুলি ধীরে ধীরে বলিয়া থাকি, খুব দ্রুত বলিয়া, আবার মাঝারিভাবে বলিয়াও শিক্ষা করি। এইরূপ মাত্রা ও দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতভাবে চলিয়া থাকে। তাহাকে মাত্রার গতি বলা হয়। যেমন ঃ—দ্রুতগতি, মধ্যগতি ও বিলম্বিতগতি। সাধারণতঃ মধ্যগতিতে গান গাহিতে হয়। চলিত কথায় বিলম্বিতকে ঢিমা, মধ্যকে মধ্যম ও দ্রুতকে জলদ বলা হয়।

মাত্রাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই কেন ?

কতটুকু সময়কে মাত্রা ধরা হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় নাই। যে গায়ক, সে যে পরিমাণ সময়কে আদর্শ করিয়া লয় তাহাই মাত্রা হয়। মাত্রায় ওজন্ নিরূপণ করা গায়কের কাজ। এখানে একটি উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইবার পক্ষে সহজ করিয়া দিতেছি। রাম ও শ্যামকে একটা ঘরের দৈর্ঘ্য কত হাত মাপিয়া দেখিবার জন্য বলা হইলে রাম আসিয়া বলিল চৌদ্দ হাত, আর শ্যাম আসিয়া বলিল ষোল হাত। একই ঘরের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে দুইজন দুই প্রকার বলাতে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। কারণ দুই জনের হাত এক সমান নহে। রাম তাহার নিজের হাতকে 'আদর্শ' করিয়া মাপিয়াছে। শ্যামও তাহার নিজের হাতকে 'আদর্শ' করিয়া মাপিয়াছে। গায়ক বা বাদকের মনের গতি যখন যেরূপ থাকে, মাত্রার গতিও সেইরূপই হয়। যদু হয় ত এক সেকেণ্ডকে এক মাত্রা ধরিয়া গান করিতেছে। আবার সেইস্থানেই মধু দুই সেকেণ্ডকে এক মাত্রা ধরিয়া গান করিতেছে। প্রথম শিক্ষার্থীর মনে এই কথা উঠিবে যে, স্থান মাপিবার জন্য ইঞ্চি নাম দিয়া যেমন একটু পরিমাণ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া

লওয়া হইয়াছে, সময় মাপিবার জন্যও সেইভাবে একটু সময়কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হউক না যাহাকে মাত্রা বলা যাইবে? ইহার উত্তরে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, ঘড়ি যেমন দিন-রাত সময়কে সূক্ষ্ম সমান অংশে ভাগ করিয়া দিতেছে, তাহা যন্ত্র ছাড়া মানুষের দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষের মনের গতি সব সময়ে সমান থাকে না। আর যদি সব সময়ে এক ওজনের মাত্রা দিয়া গান করা হয় তবে তাহা বড় একঘেয়ে হইয়া পড়ে ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য হানি করে। সেই জন্যই মাত্রার ওজন ঠিক করিবার ভার গায়ক বাদকের উপর দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যে পরিমাণ কালকে আদর্শ করিয়া লওয়া হইবে তাহা গীত বা বাদ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান রাখিতে হইবে।

মাত্রার চিহ্ন

মাত্রার চিহ্ন বিসর্গ (ঃ)। সঃ লেখা থাকিলে 'স' স্বর এক মাত্রা বুঝিতে হইবে। সঃ রঃ লেখা থাকিলে 'স' স্বর এক মাত্রা ও 'র' স্বর একমাত্রা কাল ধ্বনিত হইবে। সঃ—ঃ এই লেখা থাকিলে 'স' স্বর দুই মাত্রা বুঝিতে হইবে। যতই মাত্রাসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ততই বিসর্গ চিহ্ন সরল রেখা দ্বারা যোগ করিয়া মাত্রাসংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হইবে।

দুই বা ততোধিক স্বর একমাত্রা কাল মধ্যে উচ্চারিত হইলে স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরে বিসর্গ বসে। যথাঃ—সরঃ। এইরূপ লেখা থাকিলে 'স' ও 'র' দুই স্বরে মিলিয়া একমাত্রা বুঝিতে হইবে। এখানে 'স' অর্দ্ধমাত্রা ও 'র' অর্দ্ধমাত্রা উভয়ে মিলিয়া একমাত্রা। সরগঃ লেখা থাকিলে 'স' 'র' ও 'গ' এই তিন স্বর একমাত্রা কাল মধ্যে ধ্বনিত হইবে বুঝিতে হইবে। সরগমঃ লেখা থাকিলে 'স', 'র', 'গ' ও 'ম' এই চার স্বর মিলিয়া এক মাত্রা এবং প্রত্যেকটি স্বর সিকিমাত্রা বুঝিতে হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে মাত্রার জ্ঞান অতি সত্বর জন্মাইবার সহজ উপায়

মাত্রার জ্ঞান জন্মাইবার সহজ উপায়

একটি কম মূল্যের পেণ্ডুলাম যুক্ত ঘড়ির* (wall-clock) টক্ টক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে টোকা দিয়া অভ্যাস করা। অনেকে 'সমকাল পর পর টোকা দিয়া মাত্রাসাধন করিবার কথা বলেন। কিন্তু তাহাতে এই অসুবিধা হয় যে, যাহারা শিক্ষক ব্যতিরেকে গীত শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাহারা বুঝিতেই পারে না তাহাদের টোকা বা তালি সমকাল পর পর পড়িতেছে কি-না।

ঘড়ির পেণ্ডুলাম ডান দিকে আসিয়া যে টক্ টক্ শব্দ করিবে সেই শব্দের একসঙ্গে মাটিতে পা দিয়া তালি দিতে হইবে। পেণ্ডুলাম যখন ডান দিক হইতে বাম দিকে যাইতে থাকিবে পায়ের অগ্রভাগও সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে উঠিবে। আবার যখন বামদিক হইতে ইহা ডান দিকে যাইবে সঙ্গে সঙ্গে পাও নীচের দিকে যাইবে এবং সেদিকে পেণ্ডুলামের শব্দ হইবার একসঙ্গে পায়ের তালি পড়িবে। তালির সঙ্গে সঙ্গে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্কগুলি গুণিলে ভাল হয়। এই তালিগুলি মাত্রা হইবে। অর্থাৎ ডানদিকে পেণ্ডুলামে যে শব্দ হইবে তাহাই একমাত্রা ধরিতে হইবে। পায়ের গোঁড়ালী সব সময় মাটিতে থাকিবে। পায়ের অগ্রভাগ মাত্র তালি দিবার জন্য তুলিতে হইবে।

এইরূপ কিছুদিন তালি দিয়া অভ্যাস করিয়া পরে পেণ্ডুলামের প্রতি শব্দে তালি দিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কয়েকদিন এইরূপ ভাবে অভ্যাস করিলে অতি সত্বর মাত্রার ওজনের জ্ঞান জন্মিবে।

* পাশ্চাত্য দেশ হইতে মেট্রোনাম নামে এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাও ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত টক্ টক্ শব্দ করিয়া সময়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মূল্য ঘড়ির চেয়ে বেশী। ঘড়ি থাকিলে সময় নিরূপণও করা যায়; আবার মাত্রাসাধনের পক্ষেও সুবিধা হয়, এই জন্যই ঘড়ির সাহায্য লইবার কথা বলা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কণ্ঠমার্জ্জন

কর্কশ কণ্ঠ কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুমধুর করা যায় সেই সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলিতেছি। কারণ সুকণ্ঠ না হইলে গান গাওয়াই বৃথা, বলিতে হইবে। আমাদের দেশে কি ভাবে সাধনা করিলে কণ্ঠ সুমধুর হয় তাহা অনেকেই জানেন না। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, 'হিংস্র জন্তুরা পর্য্যন্ত হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া কাছে আসিয়া গান শোনে।' কিন্তু কর্কশ কণ্ঠের গান শুনিয়া পশুপক্ষী বশ হয় না নিশ্চয়। যে স্বর শুনিয়া মোহিত হইবে তাহা সুমধুর হওয়া দরকার। আবার অনেকে কণ্ঠস্বর ভাল নয় বলিয়া গান গাওয়াও ত্যাগ করেন। কাজেই কি করিয়া কণ্ঠসাধনা করিলে কণ্ঠস্বর মধুর হয় তাহা জানিয়া কণ্ঠ যাহাতে সুমিষ্ট হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

কণ্ঠমার্জ্জন আবশ্যক কেন ?

মুখের ভাব যখন যেরূপ থাকে কণ্ঠের আওয়াজও সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষ রাগান্বিত হইলে প্রথমে মুখের দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেই সময় যে-কোন কথা বলিলেই তাহাতে রাগের ভাব প্রকাশ পায় এবং কথাগুলি কর্কশ হয়, মধুর হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুখের ভাব যে সময় যেরূপ থাকিবে কণ্ঠের আওয়াজও সেইরূপ হইবে। মুখ গোলাকৃতি করিলে শোকসূচক আওয়াজ বাহির হয়। দাঁতে দাঁতে মিশাইয়া গান করিলে বা কথা বলিলে ছন্ ছন্ আওয়াজ হয়। খুব বড় হাঁ করিয়া গান করিলে কঠোর আওয়াজ বাহির হয়।

স্বর কর্কশ হয় কেন ?

মুখের ভাব এরূপ করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে কোনরূপ দোষ প্রকাশ না পায়। সর্ব্বদা হাসি হাসি ভাবে গান করিতে হয়। ঠোট দুইটি দাঁতের উপর সমানভাবে থাকিবে যেন দাঁত বাহির হইয়া না পড়ে। মুখের হাঁ

কি করিলে স্বর মধুর হয় ?

যেন এক বৃদ্ধাঙুলীর বেশী ফাঁক না হয়। জিহ্বার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। জিহ্বা যত বাহিরের দিকে আসিবে ততই কর্কশ আওয়াজ হইবে এবং জিহ্বা যতই ভিতরের দিকে থাকিবে ততই মধুর আওয়াজ বাহির হইবে।

শ্বাসনালী স্বর বাহির হইবার একমাত্র পথ। জিহ্বা ভিতরের দিকে কতক চাপিয়া শ্বাসনালীর মুখ খুলিয়া দিলেই গোল সুমিষ্ট আওয়াজ বাহির হইবে। জিহ্বা সমতল ভাবে থাকিবে, যেন স্বর বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া না যায়।

মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিতে হয় ও মাথা পিছন দিকে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া কণ্ঠসাধনা করিতে হয়। তাহাতে শ্বাসনালীতে কোনরূপ চাপ পড়িতে পারে না। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, স্বর বাহির হইবার পথ খোলা আছে কি-না ও সুমধুর আওয়াজ বাহির হইতেছে কি-না।

প্রথম প্রথম পাঁচ-ছয় মিনিট সাধনা করিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস করা যেন একাদিক্রমে না হয়। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লইয়া অভ্যাস করিতে হয়। দিনে এইরূপ চার-পাঁচ বার সাধনা করিয়া ক্রমে দুই-এক মিনিট করিয়া বাড়াইয়া পনর মিনিট পর্য্যন্ত প্রথম অবস্থায় সাধনা করা উচিত। পরে আরও যতই অনেক বিষয় শিক্ষা হইতে থাকিবে ততই ক্রমে সাধনকাল বাড়াইতে হইবে। তখন দিনে এক ঘণ্টা করিয়া তিনবার সকালে বিকালে ও রাত্রিতে সাধনা করা উচিত। কণ্ঠসাধনা

যদি গান গাহিতে গাহিতে গলায় একটু বেদনা হইতেছে বুঝিতে পারা যায় বা গলায় আলস্য আসে বা গলার স্বর কাঁপিতে থাকে তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম লইতে হইবে। একজন যন্ত্রশিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম অবস্থায়ও তিন-চার ঘণ্টা বাজাইলে অনিষ্ট হয় না; কিন্তু গীতশিক্ষার্থীর শ্বাসনালীর কঠোর সাধন সহ্য হয় না। অপরিমিত সাধনা করিলে হিতে বিপরীত হয়। কণ্ঠের অনিষ্টকর বিষয় কি কি?

খাইবার পরক্ষণেই সাধনা করা ও গান করা উচিত নহে। অসুস্থ অবস্থায়

বা উপবাসজনিত দুর্ব্বলতায় সাধনা করা ভাল নয়। অতিরিক্ত ভোজন, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা, অতিরিক্ত টক্ বা অত্যধিক মিষ্টান্ন খাওয়া ভাল নহে। সর্ব্বদা বরফ জল খাইলে স্বর বসিয়া যায়। যে-কোনরূপ মাদক দ্রব্য খাওয়া কণ্ঠের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

অতিরিক্ত খাদ সুর বা অতিরিক্ত চড়া সুর সাধনা করিতে থাকা উচিত নহে বা বলপূর্ব্বক চড়া বা খাদ সুর বাহির করিবার চেষ্টা করা ভাল নহে। যে সুরগুলি অনায়াসে বাহির হয় সেই সুরগুলি সর্ব্বদা সাধন করিলে কয়েক দিন পরে চড়া বা খাদের দিকে আর একটা সুর অনায়াসে বাহির হয়। এইরূপ ভাবে সাধনা করিতে করিতে ক্রমে তিন সপ্তকের প্রায় সবগুলি স্বরই কণ্ঠে আয়ত্ত করা যায়। মুদারার স্বরগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ত হইলে উদারার দিকে বা তারার দিকের সুরগুলি সাধনা করা কর্ত্তব্য।

উচ্চ স্বরে কথা বলা, চীৎকার করা, অস্বাভাবিক ভাবে কোন আওয়াজ বাহির করিবার চেষ্টা করা, উচ্চ হাস্য দেওয়া কণ্ঠের পক্ষে হানিকর। খুব জোরে গান করা যেমন কণ্ঠের পক্ষে অনিষ্টকর, ক্ষুদ্র আওয়াজে গান করাও তেমনই অনিষ্টকর। সর্দ্দি বা কাশি হইলে সাধনা না করাই ভাল।

মুখ অবনত করিয়া গান করা ভাল নহে, ইহাতে শ্বাসনালীর উপর চাপ পড়িয়া থাকে ও স্বর বাহির করা কষ্টকর হয়। কোন আবদ্ধ ঘরে সাধনা করা উচিত নহে। তথায় সুমধুর স্বর বাহির করা কষ্টকর হয়। মুক্ত বাতাসে বসিয়া সাধনা করা উচিত। কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া স্বরসাধনা করাই ভাল।

গলায় বয়সা ধরা

বালকবালিকাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গলা ভারী হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ গলা ভারী হওয়াকে বয়সা ধরা বলে। প্রত্যেকেরই কিশোর বয়সে স্বর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ও গলার স্বর গম্ভীর ভাব ধারণ করে। বয়সা ধরার সঙ্গে সঙ্গে গান করিতে বেশ কষ্ট হয়। ইহা দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। কাহারও আবার বেশী সময়ও থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত

স্বর গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া একটা স্থানে স্থায়ী হইয়া না দাঁড়ায় ততদিন পর্য্যন্ত সাধনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে মধুর স্বরে গান গাওয়া চিরদিনের মত বন্ধ করিতে হয়। কারণ তখন গান করিতে কষ্ট হয় ও বলপূর্ব্বক গান করিতে করিতে গলার স্বর এত কর্কশ হইয়া পড়ে যে, শেষে ঘষিয়া মাজিয়াও কণ্ঠস্বর আর তত সুমধুর করিতে পারা যায় না। বয়সা ধরার সময় উচ্চস্বরে কথা বলা চীৎকার করা বা উচ্চহাস্য করাও অনিষ্টকর।

কণ্ঠমার্জ্জনা সম্বন্ধে ভ্রম ধারণা

অনেকে সুমধুর কণ্ঠ করিবার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, এলাচি, গরম মোহনভোগ ও ঘি ইত্যাদি খাইয়া থাকেন। তাহাতে উপকার কিছুই হয় না বরং অপকার হইয়া থাকে। তবে সর্দ্দি বা কাশি থাকিলে দুই-একটা লবঙ্গ খাওয়া দরকার হয়। অনেকে ভরা শীতে আকণ্ঠ জলে নামিয়া স্বরসাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কম্পন ও গিটকারী সহজে গলায় আয়ত্ত করিবার ইহাই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা যে কত অনিষ্টকর তাহা ভাবিয়া দেখেন না। অনেকেই গ্রীষ্মে আকণ্ঠ জলে নামিয়া স্বরসাধনা করেন, তাহাতে নাকি গলার স্বর মধুর হয়। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি জানি না। তবে পৌষ-মাঘ মাসে আকণ্ঠ জলে নামিয়া সাধনা করিলে কফ রোগ হইবারই সম্ভাবনা বেশী।

মুদ্রাদোষ

কণ্ঠসাধনের সময় থুথু ফেলা বা কাশি দেওয়ার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা পরে একটা বদ্ অভ্যাস হইয়া পড়ে। গান গাহিবার সময়ও কাশি উঠিয়া পড়ে ও সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যের বিঘ্ন উৎপন্ন করে।

গান গাহিবার সময় মুখ বিকৃতি, মাথা নাড়া, ভ্রূ-চক্ষুর বিশ্রী ভঙ্গী করা, হাত নাড়া ইত্যাদি মুদ্রাদোষ অত্যন্ত অতৃপ্তিকর। এইসব মুদ্রাদোষ একবার হইয়া পড়িলে আর ছাড়াইতে পারা যায় না। কাজেই প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হয়। একটা বড় আয়নার সাম্‌নে বসিয়া সাধনা করা উচিত, তাহাতে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া যায়।

নাকি সুরে গান গাওয়াও একপ্রকার মুদ্রাদোষ। এদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নাকি সুরে গান করিলে গানের মিষ্টতা নষ্ট হয়। গাহিবার সময় হেচ্‌কি দিয়া শ্বাস লইবার অভ্যাস করা ভাল নহে। তাহাতে সঙ্গীতের মাধুর্য্য নষ্ট হয়।

সারেঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গান গাহিলে স্বর মধুর হয় কিন্তু তাহাতেও নানা অসুবিধা আছে। স্বরজ্ঞান কতক জন্মিলে পর কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গীত অভ্যাস করাই উত্তম।

গলার স্বর মধুর রাখিবার বড় জিনিষ স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা। স্বাস্থ্য নির্ম্মল রাখিতে পারিলেও উপরি উক্ত মতে ধৈর্য্য ধরিয়া কণ্ঠমার্জ্জনা করিতে পারিলে কণ্ঠস্বর মধুর হইবে।*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বর ও মাত্রাসাধন

সাতটি সুর যখন মাত্রার সাহায্যে গীত বা বাদিত হয় তখন তাহাকে 'স্বর-সাধনপ্রণালী' বলে। সুর ও মাত্রা এক সঙ্গে সাধন করিবার জন্য নীচে কতকগুলি স্বর-সাধনপ্রণালী দিতেছি। প্রথম শিক্ষার্থীর ধৈর্য্য ধরিয়া স্বর-সাধনপ্রণালী অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে মাত্রার সূক্ষ্ম জ্ঞান হয়, সুরপরিচয় অতি সত্বর জন্মে ও কণ্ঠের জড়তা নষ্ট হয়।

মাত্রাসাধন করিবার জন্য প্রথম প্রথম ঘড়ির সাহায্য নেওয়া ভাল ও প্রাথমিক সুর-সাধন পক্ষে বক্স হারমোনিয়ম সুবিধাজনক, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

* সঙ্গীতাচার্য্য ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কৃত "গীত-সূত্রসার" পুস্তকে কণ্ঠমার্জ্জনা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ এই বিষয় আলোচনা করেন নাই।

স্বরগুলিকে স, র, গ, ম, প, ধ, ন, লিখিলেও সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি বলিয়াই উচ্চারণ করিতে হইবে। স্বর-সাধন করিবার সময় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কণ্ঠমার্জ্জনা প্রসঙ্গে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

প্রথম পাঠ

(ক)

সঃ রঃ গঃ মঃ পঃ ধঃ নঃ সঃ ।

সঃ নঃ ধঃ পঃ মঃ গঃ রঃ সঃ ॥

এখানে প্রতি স্বর এক মাত্রা। কাজেই ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ অনুযায়ী পায়ে তালি দিয়া প্রতি তালির সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়মের এক-একটি স্বর বাজাইতে হইবে ও তাহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া স্বর উচ্চারণ করিতে হইবে। নীচের দুইটি স্বর-সাধনও এইরূপভাবে সাধিতে হইবে।

(খ)

সঃ সঃ রঃ রঃ, গঃ গঃ মঃ মঃ, পঃ পঃ

ধঃ ধঃ, নঃ নঃ সঃ সঃ । সঃ সঃ নঃ নঃ, ধঃ

ধঃ পঃ পঃ, মঃ মঃ গঃ গঃ, রঃ রঃ সঃ সঃ ॥

(গ)

সঃ সঃ সঃ, রঃ রঃ রঃ, গঃ গঃ গঃ,

মঃ মঃ মঃ, পঃ পঃ পঃ, ধঃ ধঃ ধঃ, নঃ

নঃ নঃ, সঃ সঃ সঃ । নঃ নঃ নঃ, ধঃ ধঃ

ধঃ, পঃ পঃ পঃ, মঃ মঃ মঃ, গঃ গঃ গঃ,

রঃ রঃ রঃ, সঃ সঃ সঃ ॥

(ঘ)

সঃ—ঃ রঃ—ঃ, গঃ—ঃ মঃ—ঃ, পঃ—ঃ ধঃ—ঃ, নঃ—ঃ সঃ—ঃ |

সঃ—ঃ নঃ—ঃ, ধঃ—ঃ পঃ—ঃ, মঃ—ঃ গঃ—ঃ, রঃ—ঃ সঃ—ঃ ॥

এখানে প্রতি স্বর দুই মাত্রা। প্রথম টোকার সঙ্গে হারমোনিয়মের 'স' সুর টিপিয়া ও কণ্ঠে 'সা' বলিয়া পরবর্ত্তী টোকার সেই সুরেই 'আ' বলিতে হইবে। এর পরের টোকার সঙ্গে 'র' সুর টিপিয়া সঙ্গে সঙ্গে 'রে' বলিতে হইবে ও পরবর্ত্তী টোকায় 'এ' বলিতে হইবে। এইরূপ গঃ মঃ পঃ ধঃ স্থানে যথাক্রমে গা, মা, পা, ধা বলিতে হইবে ও মধ্যবর্ত্তী মাত্রাস্থানে 'আ' বলিতে হইবে। নঃ স্থানে টোকার সঙ্গে 'ন' সুর টিপিয়া 'নি' উচ্চারণ করিতে হইবে ও পরবর্ত্তী টোকায় 'ই' বলিতে হইবে। এইরূপে এক-একটি সুরের পরে মাত্রা স্থানে আ, এ, ই বলিয়া সাধিতে হইবে। পরবর্ত্তী স্বর-সাধনপ্রণালীটিও এইরূপ ভাবে সাধিতে হইবে।

সঃ—ঃ—ঃ, রঃ—ঃ—ঃ, গঃ—ঃ—ঃ, মঃ—ঃ—ঃ, পঃ—ঃ—ঃ, ধঃ—ঃ—ঃ,

নঃ—ঃ—ঃ, সঃ—ঃ—ঃ, নঃ—ঃ—ঃ, ধঃ—ঃ—ঃ, পঃ—ঃ—ঃ, মঃ—ঃ—ঃ,

গঃ—ঃ ঃ, রঃ—ঃ—ঃ, সঃ—ঃ—ঃ ॥

দ্বিতীয় পাঠ

(ক)

সরঃ গমঃ পধঃ নসঃ | সনঃ ধপঃ মগঃ রসঃ ॥

এখানে দুইটি সুর একমাত্রা কাল ধ্বনিত হইবে। পায়ের টোকা পড়িবামাত্র 'স' সুর টিপিয়া 'সা' উচ্চারণ করিতে হইবে ও পায়ের অগ্রভাগ উপরের দিকে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'র' সুর টিপিয়া 'রে' উচ্চারণ করিতে হইবে। আবার উপর হইতে পা নীচে মাটিতে পড়িবামাত্র 'গ' সুর টিপিয়া 'গা'

উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে সাধন করিবার জন্য নীচে আরও কয়েকটি সুরপ্রণালী দিতেছি।

(খ)

সসঃ ররঃ, গগঃ মমঃ, পপঃ ধধঃ ননঃ সসঃ |

সসঃ ননঃ, ধধঃ পপঃ, মমঃ গগঃ, ররঃ সসঃ ‖

(গ)

সরঃ রগঃ গমঃ মপঃ পধঃ ধনঃ নসঃ |

সনঃ নধঃ ধপঃ পমঃ মগঃ গরঃ রসঃ ‖

(ঘ)

সরঃ গঃ, রগঃ মঃ, গমঃ পঃ, মপঃ ধঃ, পধঃ নঃ, ধনঃ সঃ

সনঃ ধঃ, নধঃ পঃ, ধপঃ মঃ, পমঃ গঃ, মগঃ রঃ, গরঃ সঃ ‖

এখানে 'স' সুরের উপর এক টোকা ও 'গ' সুরের উপর এক টোকা পড়িবে।

(ঙ)

সরঃ গমঃ, রগঃ মপঃ, গমঃ পধঃ, মপঃ ধনঃ, পধঃ নসঃ |

সনঃ ধপঃ, নধঃ পমঃ, ধপঃ মগঃ, পমঃ গরঃ, মগঃ রসঃ ‖

(চ)

সরঃ গমঃ পঃ, রগঃ মপঃ ধঃ, গমঃ পধঃ নঃ মপঃ ধনঃ সঃ |

সনঃ ধপঃ মঃ, নধঃ পমঃ গঃ, ধপঃ মগঃ রঃ, পমঃ গরঃ সঃ ‖

(ছ)

সরঃ গমঃ পধঃ, রগঃ মপঃ ধনঃ, গমঃ পধঃ নসঃ |
সনঃ ধপঃ মগঃ, নধঃ পমঃ গরঃ, ধপঃ মগঃ রসঃ ॥

(জ)

সরঃ গমঃ পধঃ নঃ, রগঃ মপঃ ধনঃ সঃ
সনঃ ধপঃ মগঃ রঃ, নধঃ পমঃ গরঃ সঃ

তৃতীয় পাঠ

(ক)

সরঃ সরঃ গঃ, রগঃ রগঃ মঃ, গমঃ গমঃ
পঃ, মপঃ মপঃ ধঃ, পধঃ পধঃ নঃ, ধনঃ ধনঃ
সঃ। সনঃ সনঃ ধঃ, নধঃ নধঃ পঃ, ধপঃ ধপঃ
মঃ, পমঃ পমঃ গঃ, মগঃ মগঃ রঃ, গরঃ গরঃ
সঃ ॥

(খ)

সরঃ সঃ, সরঃ গরঃ সঃ, সরঃ গমঃ গরঃ
সঃ, সরঃ গমঃ পমঃ গরঃ সঃ, সরঃ গমঃ পধঃ
পমঃ গরঃ সঃ, সরঃ গমঃ পধঃ নধঃ পমঃ গরঃ
সঃ, সরঃ গমঃ পধঃ নসঃ সনঃ ধপঃ মগঃ রসঃ

(গ)

সনঃ সঃ, সনঃ ধনঃ সঃ, সনঃ ধপঃ ধনঃ সঃ,
সনঃ ধপঃ মপঃ ধনঃ সঃ, সনঃ ধপঃ মগঃ মপঃ
ধনঃ সঃ, সনঃ ধপঃ মগঃ রগঃ মপঃ ধনঃ সঃ,
সনঃ ধপঃ মগঃ রসঃ সরঃ গমঃ পধঃ নসঃ ।

(ঘ)

সঃ গঃ, রঃ মঃ, গঃ পঃ, মঃ ধঃ, পঃ নঃ, ধঃ সঃ
সঃ ধঃ, নঃ পঃ, ধঃ মঃ, পঃ গঃ, মঃ রঃ, গঃ সঃ ॥

(ঙ)

সঃ মঃ, রঃ পঃ, গঃ ধঃ, মঃ নঃ, পঃ সঃ ।
সঃ পঃ, নঃ মঃ, ধঃ গঃ, পঃ রঃ, মঃ সঃ ॥

(চ)

সঃ পঃ, রঃ ধঃ, গঃ নঃ, মঃ সঃ ।
সঃ মঃ, নঃ গঃ, ধঃ রঃ, পঃ সঃ ॥

(ছ)

সরঃ সঃ, সগঃ সরঃ সঃ, সমঃ সগঃ সরঃ সঃ,
সপঃ সমঃ সগঃ সরঃ সঃ, সধঃ সপঃ সমঃ সগঃ
সরঃ সঃ, সনঃ সধঃ সপঃ সমঃ সগঃ সরঃ সঃ,
সসঃ সনঃ সধঃ সপঃ সমঃ সগঃ সরঃ সঃ ।

চতুর্থ পাঠ

কড়ি-কোমল সাধন *

(ক)

সঃ	রঃ	গঃ	মঃ	পঃ	ধঃ	নোঃ	সঃ	ন কোমল
সঃ	নোঃ	ধঃ	পঃ	মঃ	গঃ	রঃ	সঃ	

(খ)

সঃ	রঃ	গোঃ	মঃ	পঃ	ধঃ	নোঃ	সঃ	গ ও ন কোমল
সঃ	নোঃ	ধঃ	পঃ	মঃ	গোঃ	রঃ	সঃ	

(গ)

সঃ	রঃ	গোঃ	মঃ	পঃ	ধোঃ	নোঃ	সঃ	গ,ধ ও ন কোমল
সঃ	নোঃ	ধোঃ	পঃ	মঃ	গোঃ	রঃ	সঃ	

(ঘ)

সঃ	রোঃ	গঃ	মঃ	পঃ	ধোঃ	নঃ	সঃ	র ও ধ কোমল
সঃ	নঃ	ধোঃ	পঃ	মঃ	গঃ	রোঃ	সঃ	

(ঙ)

সঃ	রোঃ	গঃ	মঃ	পঃ	ধোঃ	নোঃ	সঃ	র, ধ, ন কোমল
সঃ	নোঃ	ধোঃ	পঃ	মঃ	গঃ	রোঃ	সঃ	

* কড়ি-কোমল স্বরগুলি ওকার ও ঈকার দিয়াই উচ্চারণ করিতে হইবে।

(চ)

সঃ	রোঃ	গোঃ	মঃ	পঃ	ধোঃ	নোঃ	সঃ	}	র, গ, ধ, ন কোমল
সঃ	নোঃ	ধোঃ	পঃ	মঃ	গোঃ	রোঃ	সঃ		

(ছ)

সঃ	রঃ	গঃ	মীঃ	পঃ	ধঃ	নঃ	সঃ	}	কড়ি ম
সঃ	নঃ	ধঃ	পঃ	মীঃ	গঃ	রঃ	সঃ		

(জ)

সঃ	রোঃ	গঃ	মীঃ	পঃ	ধোঃ	নঃ	সঃ	}	কড়ি ম, র ও ধ কোমল
সঃ	নঃ	ধোঃ	পঃ	মীঃ	গঃ	রোঃ	সঃ		

(ঝ)

সঃ	রোঃ	গোঃ	মীঃ	পঃ	ধোঃ	নঃ	সঃ	}	কড়ি ম, র, গ, ধ
সঃ	নঃ	ধোঃ	পঃ	মীঃ	গোঃ	রোঃ	সঃ		কোমল

(ঞ)

সঃ	রোঃ	গোঃ	মীঃ	পঃ	ধোঃ	নোঃ	সঃ	}	কড়ি ম, র, গ,
সঃ	নোঃ	ধোঃ	পঃ	মীঃ	গোঃ	রোঃ	সঃ		ধ, ন কোমল

এখানে চারিটি পাঠে ত্রিশটি স্বর-সাধনপ্রণালী দেওয়া গেল। এইগুলি মাত্রার বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত গতিতে অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথমে হারমোনিয়ম ও ঘড়ির সাহায্যে এক-একটি স্বর-প্রণালী কয়েকদিন পর্য্যন্ত সাধন করিয়া পরে হারমোনিয়ম ও ঘড়ি ছাড়া শুধু গলায় বই দেখিয়া হাতে

মাত্রা দিয়া সাধিতে হইবে। যন্ত্র ছাড়া খালি গলায় সুরগুলি সঠিক ভাবে বাহির হইলে বুঝিতে হইবে কিছু স্বরজ্ঞান জন্মিয়াছে।

স্বর প্রণালী যতই অভ্যাস করা যাইবে সূক্ষ্ম সুর ও মাত্রাজ্ঞান ততই বাড়িবে। সঠিক ভাবে স্বরলিপি দেখিয়া গীত শিক্ষা করিতে হইলে স্বর ও মাত্রার সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা অতি আবশ্যক।

স্বরবিন্যাস

শুদ্ধ সুর ও পাঁচটি বিকৃত সুর ও মোট বারটি সুরকে নানাভাবে উলট পালট করিয়া সজ্জিত করিবার নাম স্বরবিন্যাস। যথা—

পঃ—ঃ পঃ মীঃ—ঃ গঃ মীঃ—ঃ পঃ গঃ—ঃ রঃ ন̣ঃ রঃ—ঃ গঃ—ঃ রঃ সঃ—ঃ—ঃ,

সঃ রঃ গঃ মীঃ—ঃ পঃ মীঃ ধঃ পঃ স̇ঃ—ঃ স̇ঃ নঃ—ঃ

ধঃ পঃ মীঃ—ঃ গঃ—ঃ রঃ ন̣ঃ রঃ সঃ—ঃ—ঃ

এখানে ছয়টি শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের মধ্যে মী (কড়ি মধ্যম) মাত্র লইয়া অর্থাৎ স—র—গ—মী+প—ধ—ন+স̊ এই কয়টি লইয়া স্বর বিন্যাস করা হইয়াছে।

রাগ-রাগিণী কি?

এইভাবে বারটি সুরের যে-কোন কয়েকটি সুর লইয়া অনেক স্বরবিন্যাস রচনা করিতে পারি। এইসব স্বরবিন্যাসকে হিন্দুসঙ্গীতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে এক-কথায় রাগ-রাগিণী বলা হয়।

উপরে যে স্বরবিন্যাসটি দেওয়া হইয়াছে ইহার নাম 'ইমন্'। ইমন্ একটি রাগিণী। স—র—গ—মী+প—ধ—ন এই কয়টির সুর লইয়া উপরে যে ভাবে বিন্যাস করা হইয়াছে সেইভাবে গীত বা বাদিত হইলেই তাহাকে 'ইমন্' বলা হইবে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সুর দ্বারা সজ্জিত স্বরবিন্যাসকে চিনিয়া লইবার জন্য এক-একটা নাম দেওয়া হইয়াছে। রাগ-রাগিণী আর কিছুই না—কেবল এক-এক প্রকার স্বরবিন্যাস। রাগ-রাগিণীকে এককথায় বুঝাইতে রাগ বলা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খরজ পরিবর্ত্তন

যে সাতটি সুর লইয়া সঙ্গীত-শাস্ত্র গঠিত, তাহার আদি স্বর ষড়জ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দুস্থানে মুর্দ্ধণ্য 'ষ'কে অনেকটা 'খ'-এর মত উচ্চারণ করে। ষড়জ, ঋষভ ও নিষাদ যথাক্রমে খরজ, ঋখভ ও নিখাদ এইরূপ উচ্চারিত হয়। হিন্দুস্থানেই সঙ্গীতের জাগরণ হইয়াছিল, এখনও তথাকার সঙ্গীতজ্ঞগণের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করেন। আবার সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে যোগসূত্র রাখিতে হইলে হিন্দী ছাড়া উপায় নাই। কারণ গোয়ালিয়রের লোক বাংলা বুঝিবে না। হিন্দী বলিলে তাহারাও বুঝিবে, আমরাও বুঝিব। এই সব কারণে তাহাদের চলিত ভাষাই আমরা গ্রহণ করিতেছি। যাই হউক, ষড়জকেই চলিত ভাষায় খরজ বলা হয়। খরজ কি ?

সাতটি সুরের মধ্যে 'স' সুরই প্রধান সুর। কারণ ইহা হইতেই অন্যান্য ছয় সুরের উৎপত্তি হইয়াছে। ষট্ জায়ন্তে যস্মাৎ ইতি ষড়জঃ, অর্থাৎ ছয়টি সুর যথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই ষড়জ। 'স' সুর ঠিক না করিলে 'র' বা 'গ' ইত্যাদি সুরগুলি কি করিয়া পাইব ? অতএব 'স' সুর মূল সুর।

ষড়জকে পরিবর্ত্তন করার নাম খরজ পরিবর্ত্তন। যেমন কোন যন্ত্রের ষড়জকে বাদ দিয়া ঋখবকে বা গান্ধারকে, অন্য যে-কোন সুরকে খরজবৎ ধরিয়া বাদন করাকে খরজ পরিবর্ত্তন করা বলা হয়। হারমোনিয়মের যে স্বাভাবিক 'স' সুর আছে তাহাকে 'স' সুর না ধরিয়া 'গ' বা 'ম' সুর বা অন্য যে-কোন সুরকে খরজ ধরিয়া কখনও বাজাইতে হয়। এখানে প্রথম শিক্ষার্থীর মনে এই কথা উঠিবে যে, হারমোনিয়মের 'স' সুর ত 'স' সুরই আছে বা 'র' সুর ও 'র' সুরই আছে, তবে 'র' সুর কি করিয়া 'স' হইবে ? খরজ পরি-বর্ত্তন কি ?

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষের গলার সুর একপ্রকার নয়। এক-এক জনের গলায় ভারী মোটা আওয়াজ। আবার এক-এক

জনের গলায় সরু চড়া আওয়াজ। প্রত্যেকেই যখন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে তাহাদের গলায় অল্পস্বল্প বিভিন্নতা দেখা যায়। রামের গলা মোটা ভারী হওয়াতে সে হারমোনিয়মের স্বাভাবিক 'স'কে সুর করিয়া বেশ সুন্দর গাহিতে পারে। শ্যামের গলা কিছু চড়া। হারমোনিয়মের সাধারণ 'স' সুরে গলা মিলাইতেই তাহার কষ্ট হয়। তখন শ্যামের এমন একটা সুরকে খরজ ধরিয়া লইতে হইবে যাহা হইতে সে চড়ার দিকে ও খাদের দিকে অনায়াসে গাহিতে পারে।

আবার এইরূপ একটি গায়কের সঙ্গে যদি হারমোনিয়ম বাজাইতে হয়, যাঁহার খরজ গান্ধার ('গ' সুর), তখন প্রথমেই 'গ' সুরকে খরজ ধরিয়া স্বাভাবিক গ্রাম প্রস্তুত করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে কোন্ কোন্ বিকৃত সুর লাগিতেছে। এইরূপ, খরজ পরিবর্ত্তনের দরকার সব সময়েই হইতে পারে, কাজেই পরিবর্ত্তন-কৌশল শিখিয়া রাখিতে হয়।

খরজ পরিবর্ত্তন-কৌশল

প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। স্বাভাবিক গ্রামের অন্তর-বিভাগটি মনে রাখিলেই খরজ পরিবর্ত্তন করা কঠিন বোধ হইবে না।

| ১ | ১/২ | ১ |

স — র — গ + ম — প — ধ — ন + স

ইহাই স্বরগ্রাম। স হইতে র, র হইতে গ পূর্ণান্তর; গ হইতে ম অর্দ্ধান্তর; ম হইতে প, প হইতে ধ, ধ হইতে ন পূর্ণান্তর; ন হইতে র্স অর্দ্ধান্তর। উপরের এই কয়েকটি কথা মনে রাখিলেই খরজ পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। এখন, 'র' সুরকে খরজ ধরিয়া স্বাভাবিক গ্রাম প্রস্তুত করিতে হইলে কিরূপ হইবে দেখা যাক্। প্রথমতঃ 'র' সুর হইবে 'স'। তারপর 'গ' সুর হইবে 'র'। কারণ স হইতে র পূর্ণান্তর। কিন্তু 'ম' সুর গ হইবে না। কাজেই হারমোনিয়মের 'ম' সুর টিপিলে ভুল হইবে। কারণ গ

হইতে ম অর্দ্ধান্তর। কড়ি মধ্যম হইবে গ। গ হইতে ম অর্দ্ধান্তর; অতএব প হইবে ম, কারণ মী হইতে প অর্দ্ধান্তর। ধ হইবে প; ন হইবে ধ; কোমল র হইবে ন; কারণ ধ হইতে ন পূর্ণান্তর; স̊ টিপিলে অর্দ্ধান্তর হইয়া পড়ে। তারপর র̊ হইবে এ গ্রামের চড়া স̊; কারণ রো হইতে র অর্দ্ধান্তর। সুতরাং র খরজে ঃ—র = স; গ = র; মী = গ; প = ম; ধ = প; ন = ধ; রো̊ = ন; র̊ = স̊।

সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত স্বরের যে-কোন স্বরকে খরজবৎ ধরিবার আবশ্যক হইতে পারে। সেইজন্য শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের খরজ পরিবর্ত্তনতালিকা এখানে দিতেছি। তাহাতে প্রথম শিক্ষর্থীর বিশেষ সুবিধা হইবে।

খরজ পরিবর্ত্তনের তালিকা

শুদ্ধ স্বরের খরজ পরিবর্ত্তন

স—খরজ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স̊
র—খরজ	র	গ	মী	প	ধ	ন	রো̊	র̊
গ—খরজ	গ	মী	ধো	ধ	ন	রো̊	গো̊	গ̊
ম—খরজ	ম	প	ধ	নো	স̊	র̊	গ̊	ম̊
প—খরজ	প	ধ	ন	স̊	র̊	গ̊	মী̊	প̊
ধ—খরজ	ধ	ন	রো̊	র̊	গ̊	মী̊	ধো̊	ধ̊
ন—খরজ	ন	রো̊	গো̊	গ̊	মী̊	ধো̊	নো̊	ন̊

র—খরজে—রো, মী ২টি বিকৃত সুর লাগে ;
গ—খরজে—রো, গো, ধো, মী ৪টি বিকৃত সুর লাগে ;
ম—খরজে—নো ১টি বিকৃত সুর লাগে ;
প—খরজে—মী ১টি বিকৃত সুর লাগে ;
ধ—খরজে—রো, গো, ধো, মী ৪টি বিকৃত সুর লাগে ;
ন—খরজে—রো, গো, ধো, নো, মী ৫টি বিকৃত সুর লাগে ;

বিকৃত স্বরের খরজ পরিবর্ত্তন

স—খরজ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স̊
রো—খরজ	রো	গো	ম	মী	ধো	নো	স̊	রো̊
গো—খরজ	গো	ম	প	ধো	নো	স̊	র̊	গো̊
মী—খরজ	মী	ধো	নো	ন	রো̊	গো̊	ম̊	মী̊
ধো—খরজ	ধো	নো	স̊	রো̊	গো̊	ম̊	প̊	ধো̊
নো—খরজ	নো	স̊	র̊	গো̊	ম̊	প̊	ধ̊	নো̊

রো—খরজে—ম, স ২টি শুদ্ধ সুর লাগে
গো—খরজে—স, র, ম, প ৪টি শুদ্ধ সুর লাগে
মী—খরজে—ম, ন ২টি শুদ্ধ সুর লাগে
ধো—খরজে—স, ম, প ৩টি শুদ্ধ সুর লাগে
নো—খরজে—স, র, ম, প, ধ ৫টি শুদ্ধ সুর লাগে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গীত-অলঙ্কার

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কতকগুলি অলঙ্কার ব্যবহার করিবার রীতি সর্ব্বদেশে অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। আমাদের সঙ্গীতেও তেমনি কতকগুলি অলঙ্কার ব্যবহার করিবার রীতি আছে। অলঙ্কার যেমন স্ত্রীলোকের অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়াইয়া দেয়, গীত-অলঙ্কারও সেইরূপ গীত-বাদ্যকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে। অলঙ্কার ব্যবহার না করিলে গীতবাদ্য শ্রুতিমধুর হইতেই পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক সঙ্গীতশিক্ষার্থীর গীত-অলঙ্কার-সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এখানে অলঙ্কারগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও অলঙ্কার-সাধনপ্রণালী দিতেছি।

কোন একটি অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া দুই বা ততোধিক সুর গীত বা বাদন করার নাম আশ। আশ কথাটি আশা শব্দের অপভ্রংশ। আশের চিহ্ন স্বরাক্ষরের নীচে শূন্য ০ থাকে, যথা—সঃ রঃ গঃ মঃ আশ

সঃ	রঃ	গঃ	মঃ
মা	0	0	0

এখানে স সুরে 'মা' বলিয়া অন্য সুরগুলি 'আ' বলিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

সঃ	রঃ	গঃ	মঃ	পঃ	ধঃ	নঃ	র্সঃ
আ	0	0	0	0	0	0	0
অ	0	0	0	0	0	0	0
ই	0	0	0	0	0	0	0
উ	0	0	0	0	0	0	0
এ	0	0	0	0	0	0	0
ও	0	0	0	0	0	0	0

আ, অ, ই, উ, এ, ও, এই ছয়টি স্বরবর্ণ দিয়া আশ উচ্চারিত হয়। একমাত্র

আশ কেন, প্রত্যেকটি অলঙ্কারই এই ছয়টি স্বরবর্ণ দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। গানের যে কথা হইতে আশ আরম্ভ হইবে, সেই কথায় এই ছয়টি স্বরবর্ণের যে-কোন একটি থাকিবেই। সেখানেও স্বরবর্ণগুলি সুরের সঙ্গে সঙ্গে আ, আ বা এ, এ বা ই, ই উচ্চারিত হইবে এবং তাহাই আশ হইবে।

স্বর ও মাত্রাসাধনের জন্য যে সকল প্রণালী দেওয়া হইয়াছে তাহা আশ-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট। সেই পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটি স্বরপ্রণালীকে আশরূপে সাধিতে হইবে।

মীড়

একটি সুর হইতে অন্য এক, দুই বা ততোধিক সুরের মধ্যবর্ত্তী অন্তরকে ধ্বনিত করিয়া গড়াইয়া যাওয়ার নাম মীড়। সেতার, বীণা, প্রভৃতি তারযন্ত্রের পর্দ্দার উপর ঘর্ষণ, অর্থাৎ মর্দ্দন করিয়া মীড় উৎপাদন করা হয়। মর্দ্দন শব্দ হইতেই মীড় শব্দের উৎপত্তি। তারযন্ত্রের তারে আঘাত করিয়া ঐ তারসংলগ্ন কানে পাক দিলে 'গেও' করিয়া যে আওয়াজ হয় তাহাই মীড়। আশ উচ্চারিত হইলে সুরগুলি পৃথক পৃথক ধ্বনিত হয়। কিন্তু মীড়ে সুরগুলির উপর দিয়া গড়াইয়া যায় বলিয়া সুরগুলির পৃথক পৃথক শব্দ হয় না। মীড়ের চিহ্ন ‿ ; সুরের নীচে বক্র রেখা। যেমন ঃ—সঃ মঃ।

মীড়সাধন

সঃ	গরঃ,	রঃ	মগঃ,	গঃ	পমঃ,	মঃ	ধপঃ,	পঃ	নধঃ		
ধঃ	সনঃ,	নঃ	রসঃ,	সঃ	ধনঃ,	নঃ	পধঃ,	ধঃ	মপঃ,		
পঃ	গমঃ,	মঃ	রগঃ,	গঃ	সরঃ,	রঃ	ন্‌সঃ।				

মীড় সাধিবার জন্য কেবল মাত্র উপরের সুরপ্রণালীই দেওয়া হইল না, ইহা সাধিবার জন্য যে পঞ্চম পরিচ্ছেদের মধ্যে তৃতীয় পাঠের ঘ, ঙ, চ পাঠ মীড় সাধিবার উপযুক্ত তাহাও সাধিতে হইবে।

একই সুর বার বার দ্রুত উচ্চারণ করিলে কম্পন হয়। যথা :— সসসসঃ, ররররঃ ইত্যাদি। কম্পন

আ··· আ···

হারমোনিয়মের ট্রিমলো ষ্টপার খুলিয়া কম্পনসাধন করিতে হইবে। ইহাতে সত্বর কণ্ঠের কম্পন আয়ত্ত হইবে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের সবগুলি স্বর-প্রণালীই কম্পনযোগে সাধন করা যাইবে।

কতকগুলি সুর 'আশ' সহকারে দ্রুতগতিতে উচ্চারণ করাকে গিট্‌কারী বলে। গিট্‌কারী দুই প্রকার, সগমক্ গিট্‌কারী ও সাদা গিট্‌কারী। গিট্‌কারী

কণ্ঠে গিট্‌কারী বিশুদ্ধভাবে বাহির করিতে হইলে প্রথমে পঞ্চম পরিচ্ছেদের স্বরসাধনগুলির আশসাধন উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে এবং পরে আশ খুব দ্রুত সাধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

গিট শব্দ গাঁট শব্দেরই অপভ্রংশ। একটা ঘন গাঁটযুক্ত বাঁশকে হাতের মুঠায় লইয়া বাঁশটিকে এক দিক হইতে অন্যদিকে দ্রুত চালনা করিলে বাঁশের গাঁটগুলি হাতে লাগিয়া যেরূপ প্রতীয়মান হয়, সুরগুলিও খুব দ্রুত উচ্চারিত হইলে ঐরূপ মনে হয় বলিয়া ইহার নাম গিট্‌কারী হইয়াছে। গিট্‌কারীর চিহ্ন সুরের নীচে সকল রেখা, যথা—স র গ ম পঃ

কোন সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী এক, দুই বা ততোধিক সুর যদি নিমেষকালমাত্র স্থায়ী হয় এবং সেই সব সুরের ধ্বনিত কাল ঠিক করিতে পারা না যায় তবে ঐ অল্পকাল স্থায়ী সুরকে ভূষিকা বলে। ভূষিকা ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত হয়। যথা— ভূষিকা

মগঃ রগঃ ইত্যাদি।

গীতের বা গতের কোন কোন স্থানে জোর বা কোন কোন স্থানে মৃদু করিলে তাহা বড়ই শ্রুতিমধুর হয় এবং এইরূপ করিলে সুরে বৈচিত্র্য আসে। কিন্তু তাহা না হইলে গীত বা বাদ্য বড়ই একঘেয়ে হইয়া পড়ে। এখানে বলসাধনপ্রণালী দিতেছি। সুরের বলসাধন

সমবলের চিহ্ন এইরূপ ঃ— ═══ দুইটি সরল রেখা। সুর যেখান হইতে স্ফীত হয় সেখানে সুরের মাথায় < এইরূপ কোণ চিহ্ন এবং যেখান হইতে সুর মৃদু হয় সেখানে > এইরূপ কোণ চিহ্ন দেওয়া হইবে। যে সুর প্রবল, সেই সুরের উপরে 'মৃ' লেখা থাকিবে। 'বব' লেখা থাকিলে অতীব প্রবল, 'মৃমৃ' থাকিলে অতীব মৃদু বুঝিতে হইবে।*

প্রথম সা, রে, গা, মা, প্রভৃতি সুরগুলির আরোহণ অবরোহণ প্রবল, মধ্যবল ও মৃদু করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

(ক)

ব	বব		মৃ	মৃ	ব	
সঃ—ঃ—ঃ	রঃ—ঃ—ঃ	গঃ—ঃ—ঃ	মঃ—ঃ—ঃ	পঃ—ঃ—ঃ	ধঃ—ঃ—ঃ	
মৃ	˙মৃ	˙মৃ	ব	মৃ	ব	
নঃ—ঃ—ঃ	সঃ—ঃ—ঃ |	সঃ—ঃ—ঃ	নঃ—ঃ—ঃ	ধঃ—ঃ—ঃ	পঃ—ঃ—ঃ	
মৃ	মৃ	মৃ	মৃমৃ			
মঃ—ঃ—ঃ	গঃ—ঃ - ঃ	রঃ—ঃ—ঃ	সঃ—ঃ—ঃ ‖			

(খ)

বব	ব	ব	মৃ	মৃ
সরঃ গঃ—ঃ,	রগঃ মঃ—ঃ,	গমঃ পঃ—ঃ,	মপঃ ধঃ—ঃ,	পধঃ নঃ—ঃ,
মৃমৃ	˙মৃমৃ	মৃ	মৃ	ব
ধনঃ সঃ—ঃ |	সনঃ ধঃ—ঃ,	নধঃ পঃ—ঃ,	ধপঃ মঃ—ঃ,	পমঃ গঃ—ঃ,
ব	বব			
মগঃ রঃ—ঃ,	গরঃ সঃ - - ঃ ‖			

(গ)

<

সঃ—ঃ রঃ—ঃ গঃ—ঃ মঃ—ঃ পঃ—ঃ ধঃ—ঃ নঃ—ঃ সঃ—সঃ

* সঙ্গীতাচার্য্য ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অনুকরণে প্রথম সুরের বলসাধন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সঃ—ঃ নঃ—ঃ ধঃ—ঃ পঃ—ঃ মঃ—ঃ গঃ—ঃ রঃ—ঃ সঃ—ঃ

এই সাধনপ্রণালীটি প্রথমে অতি মৃদু হইতে ক্রমে স্ফীত করিয়া সঁ স্বরে অতি প্রবল করিতে হইবে। আবার সঁ স্বর হইতে ক্রমে ক্রমে স্বর অতি মৃদু করিতে হইবে।

প্রস্বন

কোন স্বর সবলে উচ্চারণ করাকে প্রস্বন (accent) বলে। গীত বা বাদ্যে স্থানে স্থানে প্রস্বন দিতে পারিলে গীত বা বাদ্যের মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়।

আক্ষেপ ও বিক্ষেপ

কোন স্বর হইতে তিন চার বা ততোধিক চড়া স্বরে একেবারে লাফাইয়া পড়ার নাম আক্ষেপ ও কোন কোন স্বর হইতে তিন চার বা ততোধিক খাদ স্বরে একেবারে লাফাইয়া নামিবার নাম বিক্ষেপ। ইহাও গীত বা বাদ্যের উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করিতে পারিলে স্বরে বৈচিত্র্য হয়।

বাঁট

গানের স্বরবিন্যাসকে ছাড়িয়া সেই রাগের পরিচায়ক অন্যান্য স্বর দ্বারা গানের কথাগুলিকে তালের প্রতি মাত্রায় উচ্চারণ করার নাম বাঁট। ইহা বণ্টন শব্দের রূপান্তর।

তান

গানের স্বরবিন্যাস ছাড়িয়া রাগের অন্য স্বর লইয়া আরোহণ অবরোহণে আশ, মীড়, গিট্‌কারী প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াও স্বরের নানাভাবে উলট্‌পালট্ করিয়া স্বরবিস্তার করাকে তান বলে। তিন স্বরের কম তান হয় না। তিন স্বরের উপর যত ইচ্ছা স্বর ব্যবহার করা যায়। তান অসংখ্য। কারণ স্বরগুলিকে নানা ভঙ্গীতে উলট্‌পালট্ করিলে অনেক হইয়া পড়ে।

গমক

আশ, মীড়, গিট্‌কারী, প্রস্বন প্রভৃতি অলঙ্কারগুলির গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনার নাম গমক।

উপজ ও কর্ত্তব

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তানকে উপজ বলে। আর গীতবাদ্যে নানা প্রকার স্বরকৌশল দেখাইবার নাম কর্ত্তব।

মূর্চ্ছনা

কোন এক সুর হইতে ক্রমে তাহার অষ্টম সুর পর্য্যন্ত আরোহণ ও তথা হইতে ক্রমে সেই সুরে অবরোহণ করাকে মূর্চ্ছনা বলে। মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এইরূপ লিখিয়াছেন, "ক্রমাৎ স্বরাণাং আরোহঞ্চাবরোহণম্ মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে, গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ।" যথা—

স—র—গ+ম—প—ধ—ন+স̇
স̇+ন—ধ—প—ম+গ—র—স

র—গ+ম-প—ধ—ন+স̇—র̇
র̇—স̇+ন—ধ—প—ম+গ—র

গ+ম—প—ধ—ন+স̇—র̇—গ̇
গ̇—র̇—স̇+ন—ধ—প—ম+গ ইত্যাদি।

স—র—গ+ম—প—ধ—ন+স̇ ইহা স্বাভাবিক গ্রাম। খরজ পরিবর্ত্তনে যেমন বিকৃত সুরের সাহায্যে এইরূপ অন্তরবিশিষ্ট অর্থাৎ গ হইতে ম ও ন হইতে স অর্দ্ধান্তর, বাকী সব পূর্ণান্তরবিশিষ্ট করিয়া লইতে হয়; মূর্চ্ছনায় সেইরূপ স্বাভাবিক গ্রামের মত অন্তরবিশিষ্ট করিয়া লইতে হয় না। হারমোনিয়মের সাদা চাবীতে 'র' সুর হইতে চড়ার দিকে পর পর কেবল সাদা চাবীগুলি বাজিয়া চড়া র পর্য্যন্ত গিয়া বা গ হইতে কেবল সাদা চাবীগুলি বাজাইয়া চড়া গ পর্য্যন্ত পর পর আরোহণ করা ও তথা হইতে সেই সুরগুলি বাজাইয়া পর পর অবরোহণ করার নাম মূর্চ্ছনা। 'র' সুর হইতে আরম্ভ হইলে তাহার নাম 'র' মূর্চ্ছনা, গ হইতে আরম্ভ হইলে তাহার নাম 'গ' মূর্চ্ছনা। এইরূপ 'ম' মূর্চ্ছনা, 'প' মূর্চ্ছনা ইত্যাদি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গীতছন্দ

ছন্দ ছাড়া যেমন পদ্য লেখা চলিতে পারে না, তেমন ছন্দ ব্যতীত গীতও হইতে পারে না। কাব্য লিখিতে যেমন তাহার ছন্দ সম্বন্ধে কতক জ্ঞান থাকা দরকার, গীত শিক্ষা করিতেও গীতের ছন্দ সম্বন্ধে কতক শিক্ষা করা দরকার হয়। এখানে কাব্যছন্দের বিশেষত্ব ও গীতছন্দ কি এবং ইহার সঙ্গে কাব্যছন্দের কি প্রভেদ সংক্ষেপে দেখাইতেছি।

কবিতার ছন্দ দুই প্রকার,—'বর্ণ' ও 'জাতি'। বর্ণ গণনা করিয়া যে ছন্দ রচিত হয় তাহাকে 'বর্ণবৃত্ত', আর মাত্রার দ্বারা যে ছন্দ গঠিত হয় তাহাকে 'জাতি' বা 'মাত্রাবৃত্ত' বলা হয়। সাতটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা কতক বুঝাইতেছি।

(১)

লেখা পড়া করে যে-ই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে-ই।

এই কবিতার এক-এক পংক্তিতে আটটি বর্ণ আছে। পড়িবার সময় প্রথম ও পঞ্চম বর্ণের উপর প্রস্বন (accent) দিয়া বা প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম বর্ণের উপর প্রস্বন দিয়া পড়িতে হইবে। যেমন :—

লেখা পড়া | করে যে-ই
গাড়ী ঘোড়া | চড়ে সে-ই

(রেফ চিহ্ন (') যে বর্ণের মাথায় থাকিবে সেই বর্ণে প্রস্বন দিতে হইবে। আবার,

লেখা পড়া করে যে-ই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে-ই

(২)

'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়॥''

এখানে এক-একটি পংক্তিতে চৌদ্দটি বর্ণ আছে। এই প্রকার ছন্দ দুই ভাবেই পড়া যায়। প্রথম অক্ষরে ও আটটি অক্ষরের পর নবম অক্ষরে প্রস্বন বা ঝোঁক দিয়া পড়িলে চলে। যেমন :—

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়

আবার যদি মাত্রাহিসাবে পড়িতে হয় তবে এইরূপ হইবে। যথা :—

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হ··য়
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু ন···য়

প্রত্যেকটি বর্ণকে এক মাত্রা ধরিয়া পড়িলে প্রথম, পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ বর্ণে প্রস্বন দিতে হইবে এবং শেষে 'হয়'-এর পর দুই মাত্রাকাল রেশটুকু টানিয়া 'অসময়ে'র 'অ'তে প্রস্বন দিতে হইবে।

(৩)

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥"

এই পদ্যটি চৌদ্দ বর্ণের হইলেও পংক্তিতে দুইটি মাত্রা দিয়া পড়িতে হইলে এইরূপ হইবে। যথা :—

পাখী সব করে রব রাতি পোহা ইল·· ||
কাননে কু সুম, কলি সকলি, ফু টিল··· ||

(৪)

"নদীতীরে বৃন্দাবনে, সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে, ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম ॥"

এই পদ্যটি ৮।৮।৬ বর্ণবিন্যাসে রচিত।

প্রথম পংক্তির প্রথম খণ্ডে আটটি বর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ডেও আটটি বর্ণ এবং নীচের পংক্তিতে ছয়টি বর্ণ। মাত্রা অনুযায়ী পড়িতে হইলে চারি বর্ণ পর পর প্রস্বন দিতে হইবে ও শেষে ষষ্ঠ বর্ণের স্থানে দুই মাত্রাকাল রেশ টানিতে হইবে। যথা ঃ—

নদীতীরে | বৃন্দাবনে | সনাতন | একমনে |
জপিছেন | নাম··· ||
হেনকালে | দীনবেশে | ব্রাহ্মণ, চ | রণে এসে |
করিল, প্র | ণাম ||

(৫)

এইরূপ

"ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর।
যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন "কেষ্টা বেটাই চোর ॥"

এই ছন্দে কিন্তু আবার ৬।৬।৭ বর্ণবিন্যাস করা হইয়াছে। পড়িতে হইলে প্রথম, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ বর্ণের মাথায় প্রস্বন দিতে হইবে। যেমন—

ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্ব্বোধ অতি | ঘোর··· ||
যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর··· ||

(৬)

আবার—

"বহে মাঘ মাস শীতের বাতাস
স্বচ্ছ সলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখি সনে
কাশীর মহিষী করুণা।"

এই ছন্দটির প্রথম হইতে প্রথম দাঁড়ি পর্য্যন্ত ৬।৬।৮ বর্ণবিন্যাস ও সেই দাঁড়ি হইতে অর্থাৎ তৃতীয় পংক্তি হইতে আর এক দাঁড়ি পর্য্যন্ত ৬।৬।৬।৬।৬।৬।৮ সংখ্যা বর্ণবিন্যাস করিয়া রচিত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া লইতে হইলে নিম্নলিখিত রূপ পড়িতে হইবে।

বহে মাঘ মাস | শীতের বাতাস |
স্বচ্ছ সলিলা | বরুণা··· ··· ||
পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জ্জনে |
শিলাময় ঘাট | চম্পক বনে ||
স্নানে চলেছেন | শত সখীসনে |
কাশীর মহিষী | করুণা··· ·· ||

কাব্যে বিদ্যুন্মালা, মত্তা, পজ্ঝটিকা, ভুজঙ্গপ্রপাত, মহতী, দাত্তকলা, তোটক, প্রভৃতি বহু ছন্দ দেখিতে পাই। সেই সকল ছন্দ নির্দ্দিষ্ট বর্ণসমষ্টি দ্বারা রচনা করা হয়। নীচে একটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে বর্ণগণনায় কোন মিল পাওয়া যায় না।

(৭)

"হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে,
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
সেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমার দেহহীন চামেলীর লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।"

উপরোক্ত পদ্যাংশে ছন্দ বর্ণগণনার উপর নির্ভর করে না। এখানে একটি পংক্তির সঙ্গে আর একটি পংক্তির বর্ণের মিল নাই। মাত্রাহিসাবে এই ছন্দ রচিত হইয়াছে। পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত ভাবে পড়িলেই মধুর হইবে।

হে সম্রাট	কবি···		
এই তব	হৃদয়ের	ছবি···	
এই তব	নব মেঘ	দূত···	
অপূর্ব্ব, অ	দ্ভুত···		
ছ-ন্দে-	গানে···		
উঠিয়াছে	অলক্ষ্যের	পানে	

সেথা তব | বিরহিণী | প্রিয়া··· |
রয়েছে | মিশিয়া··· |
প্রভাতের | অরুণ, আ | ভাসে··· |
ক্লান্ত-সন্ধ্যা | দিগন্তের | করুণ, নি | শ্বাসে··· |
পূর্ণিমার | দেহহীন | চামেলীর | লাবণ্য, বি | লাসে··· |
ভাষার, অ | তীত, তীরে |
কাঙাল, ন | য়ন যেথা | দ্বার হ'তে | ···আসে | ফিরে, ফিরে |

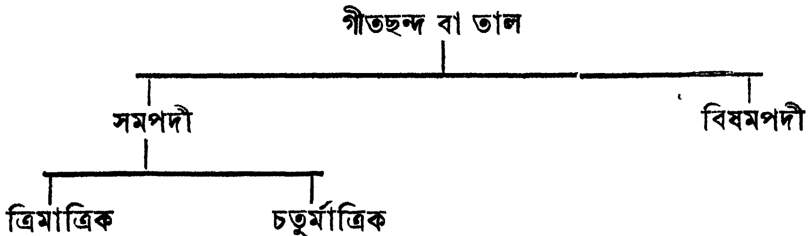
এইরূপ মাত্রা দিয়াই সঙ্গীতের ছন্দ গঠিত হয়। ছন্দের যেখানে স্বরের উপর প্রস্বন আছে, সেখানে তালি দেওয়া হয়। 'তালই' গীতের ছন্দ।

সমপদী ছন্দ ও বিষম-পদী ছন্দ

সঙ্গীতের ছন্দ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—সমপদী ছন্দ ও বিষমপদী ছন্দ।

যে ছন্দে স্বরের প্রস্বনগুলি সমমাত্রা পর পর অবস্থিত তাহাকে সমপদী ছন্দ বলে। আর যে ছন্দে স্বরের প্রস্বনগুলি সমমাত্রা পরে নহে, তাহাকে বিষমপদী ছন্দ বলে।

সমপদী ছন্দ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক।



ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক

যে স্থলে তিন মাত্রা পর পর প্রস্বন, তাহা ত্রিমাত্রিক ও যে ছন্দে চারি মাত্রা পর পর প্রস্বন তাহা চতুর্মাত্রিক। ত্রিমাত্রিক ছন্দ, যথা—

চোখের | সাম্‌নে | ধরিয়া | রাখিয়া |

চতুর্মাত্রিক ছন্দ যথা ঃ

বার মাস | সাত বার | আসে যায় | বার বার ||

বিষমপদী ছন্দ, যথা ঃ

বসিয়া | পাশাপাশি | করিছে | লাঠালাঠি

বা

দীন | ভবনে | নীল | কমল

এইরূপ তিন প্রকার ছন্দ আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক ছন্দের অন্তর্গত অনেকগুলি তাল থাকে। পরের পরিচ্ছেদে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

তাল-প্রকরণ

তাল কি

গীতের ছন্দকেই তাল বলে। গীতের ছন্দ মাত্রার সমষ্টি দ্বারা রচিত হয় বলিয়া মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলা হয়। কবিতা যেমন নানারূপ ছন্দ অনুসারে রচিত হয়, সেইরূপ গীতের বা গতের স্বরবিন্যাসও মাত্রার সাহায্যে নানা প্রকার ছন্দ অবলম্বনে রচিত হয়।

'তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণি
আমি অবাক হ'য়ে শুনি—কেবল শুনি।'

এই কবিতার মত সম সংখ্যক বর্ণসংযোগে ছত্রবন্দী হইয়া যেমন ছন্দ রচিত হয়, গীতছন্দও এইরূপ ভাবেই সম সংখ্যক মাত্রা অবলম্বনে পংক্তিবন্দী হইয়া রচিত হয়। কাব্যে তাহাকে চরণ বলে, গীতছন্দে তাহাকে আওয়ার্দা বলে। উপরোক্ত কবিতায় যেমন চৌদ্দটি বর্ণ লইয়া এক চরণ হইয়াছে, সেইরূপ গীতছন্দেও ছয় মাত্রায় আট মাত্রায় বা বার মাত্রায়, ষোল মাত্রায় এক এক প্রকার ছন্দ গঠিত হয়।

শম, ফাঁক, তালি ইত্যাদির চিহ্ন

গীত বা বাদ্যের স্থানে স্থানে যে ঝোঁক দিতে হয় সেই সব ঝোঁকে তালি দিবার ইচ্ছা হয়। কোন কোন স্থানে তালি দিতে হয় না। সেই স্থানের নাম ফাঁক। ফাঁকের চিহ্ন স্বরের মাথায় শূন্য (০)। যে স্থানে সবচেয়ে বেশী ঝোঁক পড়ে, অর্থাৎ যাহা প্রধান ঝোঁক তাহাকে শম্ বলে। শমের চিহ্ন স্বরের মাথায় যোগ (+) চিহ্ন। আর অন্যান্য ঝোঁকগুলিতে স্বরের মাথায় ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক দিয়া তালি বুঝান হয়। ১ অঙ্ক দিয়া প্রথম তালি, ২ অঙ্ক দিয়া দ্বিতীয় তালি, ৩ অঙ্ক দিয়া তৃতীয় তালি বুঝান হয় এবং এইরূপ। ছেদচিহ্ন দিয়া পদ-বিভাগ করা হয়।

শম্ কোন্ স্বরে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণতঃ গীত আরম্ভেই ফাঁক ও দ্বিতীয় তালিতে শম্ ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় তালিতে শম্ হওয়ায় ২ অঙ্ক স্থানে (+) যোগ চিহ্ন বসে। যথা ঃ

```
                    ১                    +              ৩
সঃ  গোঃ  সঃ  |  নোঃ  ধোঃ  নোঃ  |  সঃ—ঃ—ঃ  মঃ—ঃ—ঃ  ||
                 ৹     ৹     ৹

 ৹               ১                 +                   ৩    ৹    ৹
মঃ—ঃ  মঃ  |  মঃ—ঃ  গোঃ  |  গোঃ মঃ ধোঃ  |  নোঃ সঃ সঃ  ||

       ৹              ১                 +
নোঃ  সঃ  নোঃ  |  ধোঃ মঃ মঃ  |  গো মঃ সঃ  |  মঃ—ঃ—ঃ || ||
```

অনেকগুলি তালের আবার প্রথমেই শম্ থাকে। সেখানে প্রথমে + চিহ্ন দিতে হয় ও +২ ৩ এইরূপভাবে চিহ্ন দেওয়া হয়। ছন্দের এক আওয়ার্দা পূর্ণ হইলে দুইটি ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

সঙ্গত ও তালের ঠেকা

গীতের সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য বায়া-তবলা, পাখোয়াজ, প্রভৃতি তালযন্ত্র বাজান হয়। তাহাকে সঙ্গত করা বলে। গীতের সঙ্গে তালযন্ত্র চলে বলিয়াই ইহার নাম সঙ্গত হইয়াছে। গীতের এক এক আওয়ার্দা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকে। যদি এক আওয়ার্দাকে একটা গোলাকৃতি চক্র মনে করা যায় তবে সেই চক্রের এক আবর্ত্তনে এক আওয়ার্দা হইবে। আওয়ার্দায় ছন্দের রূপ বজায় রাখিবার জন্য তাহার প্রস্বনগুলি ঠিক রাখিয়া তালযন্ত্রে মিষ্টমধুর ধ্বনি বাজান হয়। তাহাকে ঠেকা বলে, ঠেকার ধ্বনিগুলির অনুকরণে ধা, ধিন্, তেরে কেটে, তা তিন প্রভৃতি যে-সব অবোধ্য শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে বোল বা বাণী বলে।

বোল বা বাণী

এখানে জানা উচিত যে, ছন্দের মাত্রাসমষ্টি যত তাহার গুণিতক (multiple) মাত্রাসমষ্টিবিশিষ্ট স্বরবিন্যাস হইবে। যেমন,—একতালা বার মাত্রার তাল। একতালা ছন্দে স্বরবিন্যাস রচনা করিতে হইলে ২৪, ৩৬, ৪৮, ৬০ ইত্যাদি ১২ দিয়া বিভাজ্য রাশি মাত্রাসমষ্টি হইতে হইবে। একতালা তালের মাত্রাসমষ্টি ৪০ কি ৫০ হইতে পারে না। সর্ব্বদা মনে

রাখিতে হইবে যে, ছন্দের আওয়ার্দা সর্ব্বদা পূর্ণমাত্রাবিশিষ্ট রাখিতে হইবে।

ত্রিমাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত তাল

পূর্ব্বে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছি, মাত্রার সংখ্যাভেদে ও প্রস্বনের বিভিন্নতায় এক-এক প্রকার ছন্দে অনেক প্রকার তাল গঠিত হয়। ত্রিমাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত ছয়টি তাল। যথা ঃ--দাদ্‌রা, ভরতঙ্গা, খেম্‌টা, আড়-খেম্‌টা, একতালা, চৌতাল।

দাদ্‌রা

১। দাদ্‌রা ছয় মাত্রার তাল. দুই ভাগে বিভক্ত (৩ | ৩ ||) প্রথমেই শম্। + | ২ এইরূপে তালি পড়ে।

ভরতঙ্গা

২। ভরতঙ্গা ও দাদ্‌রার মাত্রাসমষ্টি এক। দুই ভাগেই বিভক্ত, কিন্তু বিলম্বিত গতিতে চলিয়া থাকে। দাদ্‌রা বিলম্বিত গতিতে চলিলে ভরতঙ্গার মত হইয়া পড়ে। ইহাকে অনেকে কাশ্মীরী খেম্‌টা বলিয়া অভিহিত করে।

খেম্‌টা

৩। খেম্‌টা তাল বারটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ৩ | ৩ | ৩ | ৩ || এইরূপ চারি ভাগে বিভক্ত। ০ | ১ | + | ৩ এইরূপ ভাবে তালের চিহ্ন বসে। খেম্‌টা তালে ফাঁক দেওয়ার ইচ্ছা হয় না।

আড়-খেম্‌টা

৪। খেম্‌টা তাল আড় করিয়া গাহিবার নাম আড়-খেম্‌টা। তবে খেম্‌টা হইতে আড়্‌খেম্‌টা তালের বিলম্বিত গতি। ইহাতে তিন মাত্রা একত্র হইয়াই পদ হয়। তবে সাধারণতঃ ইহার ফাঁক পদ বিভক্ত হইয়া যায়। ফাঁক পদের প্রথম দুই মাত্রা তৃতীয় তালির পরে যোগ হয়। যেমন—

-- ‿ ৩	১ ২ ৩	১২৩	১২৩	১.২ --
তু	মি যে হে	প্রাণের	ব. ধু	"আর"

একতালা

৫। একতালা বার মাত্রার তাল। আড়-খেম্‌টা বিলম্বিত গতিতে গাহিলে একতালার মত হইয়া পড়ে। এই তাল দ্রুত, মধ্য আর বিলম্বিত এই তিন গতিতে গীত হয়। সাধারণতঃ ইহার পদবিভাগ খেম্‌টার মত ও ফাঁক হইতে গীত

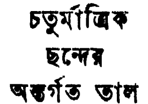
আরম্ভ হয়। কোন কোন সময়ে একতালা ৪ | ৪ | ৪ ‖ (+ ২ ৩) এইরূপ তিন ভাগেও বিভক্ত হয়, তখন তাহার ফাঁক থাকে না। প্রথমেই শম্‌ থাকে।

চৌতাল

৬। চৌতাল তালের মাত্রাসমষ্টিও বার। ইহার প্রত্যেক পদ দুই মাত্রা হিসাবে ছয়টি পদে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারিটি তালি দিতে হয় বলিয়া চৌতাল নাম হইয়াছে। ইহার পদ বিভাগ এইরূপ

```
 +       0       ২       0       ৩       ৪
| । ।  | । ।  | । ।  | । ।  | । ।  | । ।  ‖
```

চৌতালের পদবিভাগ দুই মাত্রা করিয়া হইলেও মাত্রাসমষ্টি বার বলিয়া ইহা ত্রিমাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত হইয়াছে।



কাহার্‌বা, কার্ফা, ঠুংরী, কাওয়ালী, যৎ, ঢিমাতেতালা, পটতাল, আড়াঠেকা, মধ্যমান, এই কয়টি চতুর্মাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত।

কাহার্‌বা

১। কাহার্‌বা আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতি ঝোঁকই শম্‌ বলিয়া মনে হয় এবং প্রত্যেকটি মাত্রার উপর তালি দেওয়ার ইচ্ছা হয়।

কার্ফা

২। কার্ফা আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। পদবিভাগ কাহার্‌বার মত। এই তাল নৃত্যেই বেশী ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানে এই তাল খুব প্রচলিত। ইহার অপর নাম ছেপ্‌কা।

ঠুংরী

৩। ঠুংরীও আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। যে-সব ছন্দে চারি মাত্রার পর পর স্বাভাবিক ঝোক আছে তাহা ঠুংরীর অন্তর্গত। ঠুংরীর এক-এক পদে চার মাত্রা। ইহার ফাঁক্‌ নাই, প্রথমেই শম্‌।

কাওয়ালী

৪। কাওয়ালী ষোলটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটি তালি ও একটি ফাঁক্‌। কাওয়ালীর প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রায় ঝোঁক পড়ে, সাধারণতঃ ফাঁক হইতে গীত উত্থাপন হয়। কাওয়ালীর দ্রুতগতি হইতে আর এক

তালের উৎপত্তি হয়। ইহার নাম আদ্ধা। ইহা আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইহাতেও তিন তালি এক ফাঁক।

৫। যৎ তাল দুই প্রকার। শম্‌পদী ও বিষমপদী। শম্‌পদী যৎ চতুর্মাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত ও মাত্রাসমষ্টি আট। ইহারও পদবিভাগ যৎ কাওয়ালীর মত। সাধারণতঃ ইহা শম্ হইতে উত্থাপিত হয়। কাওয়ালীতে প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রার উপর ঝোঁক পড়ে, কিন্তু যৎ এর দ্বিতীয় মাত্রার উপর ঝোঁক পড়ে।

৬। ঢিমাতেতালা ষোলটি দীর্ঘ মাত্রার ও বত্রিশটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ঢিমা তেতালা কাওয়ালীর বিলম্বিত চলাকেই ঢিমাতেতালা বলে। ইহার পদবিভাগ কাওয়ালীর ন্যায়। সাধারণতঃ প্রথম ফাঁক ও দ্বিতীয় তালে শম্।

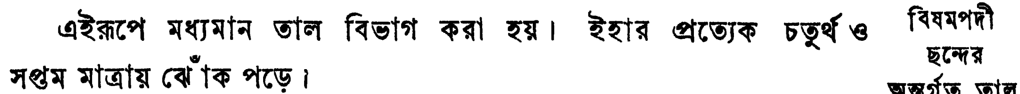
৭। পটতাল ঢিমাতেতালার অর্দ্ধেক। অর্থাৎ আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমেই শম্ ও দ্বিতীয় পদে ফাঁক। পট-তালের দুই পটতাল ফেরে ঢিমা তেতালার এক ফের হয়।

৮। আড়াঠেকা ষোল মাত্রার তাল। পদবিভাগ অনেকটা আড়- আড়াঠেকা খেম্‌টার মত। অর্থাৎ ফাঁক পদ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—

0 ১ + ৩ 0
"- -" ॥́ | ।।।́ | ́।।́ | ॥।́ | "।́"

কাওয়ালী আড় করিয়া গীত করিলেই আড়ঠেকা হয়। ইহাতে প্রথম ও তৃতীয় পদের তৃতীয় মাত্রায় ঝোঁক পড়ে। উপরে মাত্রার মাথায় রেফ্ চিহ্ন দিয়া তাহা বুঝান হইয়াছে।

৯। মধ্যমান ষোলটি দীর্ঘ মাত্রার, অর্থাৎ বত্রিশটি হ্রস্ব মাত্রার তাল, আড়াঠেকা ও মধ্যমান একই প্রকার। কাওয়ালী ও ঢিমাতেতালায় যে মধ্যমান প্রভেদ আড়াঠেকা ও মধ্যমানেও সেই প্রভেদ। মধ্যমানে ফাঁক পদের তৃতীয় মাত্রা হইতে গীত উত্থাপিত হয়। যেমন—



এইরূপে মধ্যমান তাল বিভাগ করা হয়। ইহার প্রত্যেক চতুর্থ ও সপ্তম মাত্রায় ঝোঁক পড়ে। বিষমপদী ছন্দের অন্তর্গত তাল

তেওরা, রূপক পোস্তা, ঝাঁপতাল, সুরফাক্তা, যৎ, তেওট, আড়াচৌতাল, ধামার প্রভৃতি বিষমপদী ছন্দের অন্তর্গত।

১। তেওরা সাতটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ৩ | ২ | ২ ‖ এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমেই শম্। ফাক্ নাই। + | ২ | ৩ ‖ এইরূপে তালের চিহ্ন দেওয়া হয়। তেওরা

২। তেওরা ঢিমা করিলে রূপক হইয়া পড়ে। রূপকের প্রথমে ফাঁক ধরিয়া থাকে। ০ | ১ | ২ ‖ এইরূপ ভাবে তাল দেওয়া হয়। এই ফাঁকই রূপকের শম্ বুঝিতে হইবে। রূপক

৩। পোস্তাও সাত মাত্রার তাল। ৩ | ৪ ‖ এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমেই শম্। ফাঁক নাই। পোস্তা

৪। ঝাঁপতালও দশ মাত্রার তাল। ইহাতে তিন তালি ও এক ফাঁক। পদ ২ | ৩ | ২ | ৩ ‖ এইরূপ ভাবে বিভক্ত এবং + | ২ | ০ | ৩ ‖ এইরূপ ভাবে তাল চিহ্ন বসে। ঝাঁপতাল

৫। সুরফাক্তাও দশ মাত্রার তাল। কিন্তু পদবিভাগ অন্য প্রকার। ২ | ২ | ২ | ২ | ২ ‖ এইরূপ মাত্রা বিন্যাসে দুই মাত্রা করিয়া এক-এক পদ রচিত হয়। প্রথমেই শম্। তারপর ফাক। এর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাল এবং তারও পরে ফাঁক—অর্থাৎ, + | ০ | ২ | ৩ | ০ ‖ এইরূপে তাল চিহ্ন দেওয়া হয়। সুরফাক্তা

৬। বিষমপদী যৎ পোস্তা তালের ন্যায়। পোস্তাতালের দুই ফেরে যৎ তালের এক ফের হয়। পোস্তা সাত মাত্রার তাল। যৎ চৌদ্দ মাত্রার তাল। পদবিভাগ ৩ | ৪ | ৩ | ৪ ‖ ইহাতে তিনটি তালি ও একটি ফাঁক। প্রথমেই শম্। যৎ

৭। তেওট চৌদ্দমাত্রার তাল। ইহারও তিনটি তালি একটি ফাঁক।

তেওট

যতের পদবিভাগ ৩ | ৪ | ৩ | ৪ || কিন্তু তেওটের পদবিভাগ ৪ | ৩ | ৪ | ৩ || ইহার অপর নাম ঝুম্‌রা।

ধামার

৮। ধামার ও চৌদ্দমাত্রার তাল। তেওরার দুই ফেরে ধামারের এক আওয়ার্দা হয়। পদবিভাগ এইরূপ :

+ ০ ২ ০ ৩ ০
| ।।। | ।। | ।। | ।।। | ।। | ।। ||

আড়া-চৌতাল

৯। আড়াচৌতাল চৌদ্দটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটি তালি ; ফাঁক নাই। পদবিন্যাস এইরূপ ২ | ৪ | ৪ | ৪ || প্রথমেই শম্‌।

তালগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাল ও সুর ঠিক রাখিয়া গাহিতে প্রথমে অসুবিধায় পড়িতে হয়। তখন ধৈর্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এখানে একটি উপায় বলিতেছি। তাহাতে সত্বর সুর ও তাল জ্ঞান হইবে।

তাল স্বর ও জ্ঞান জন্মাইবার সহজ উপায়

বিদ্যালয়ে আমরা বর্ণপরিচয় শেষ করিয়াই যেমন দাঁড়ি, কমা, প্রভৃতি ঠিক করিয়া রিডিং (reading) পড়িয়া যাই, গীত শিক্ষাকালেও সেইরূপই করিতে হয়। স্বরসাধনপ্রণালীগুলি অভ্যাস করিয়া করিয়া যখন সুরগুলি কণ্ঠে ওজন অনুযায়ী বসিয়া যাইবে তখন এক হাতে মাত্রা ও অন্য হাতে তাল দিয়া স্বরলিপি পুস্তক দেখিয়া পড়িতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে অতি সত্বর তাল পরিচয় হয় এবং আর মাত্রা দিবার প্রয়োজন থাকে না। কেবল তাল দিলেই যথেষ্ট।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রচলিত স্বরলিপির ব্যাখ্যা

বিকৃত সুর, মাত্রা, তাল ও অলঙ্কারগুলির চিহ্নাদির পরিচয় পূর্ব্বেই কথাপ্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। বাকী চিহ্নগুলি এখানে দিতেছি।

গীতের চারি কলি বা তুক

কবিতার যেমন চরণ বা কলি আছে সেইরূপ গৎ বা গানের স্বরবিন্যাস চারিভাগে বিভক্ত হইয়া গঠিত হয়। প্রথম কলির নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয়টির নাম অন্তরা, তৃতীয়টি সঞ্চারী ও চতুর্থটির নাম আভোগ।

আস্থায়ীকে সচরাচর ধুয়া বলা হয়। যে-কোন সুর হইতে আস্থায়ী আরম্ভ হইতে পারে। তবে সাধারণত মুদারা সপ্তকের সুর হইতেই আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় কলি-অন্তরা সাধারণত মুদারার 'ম' বা 'প' সুর হইতে আরম্ভ হইয়া তারার 'স'তে যায় ও তথা হইতে আরও কয়েকটি সুর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া পুনরায় অবরোহণক্রমে আস্থায়ীর সঙ্গে মিলিত হয়। তৃতীয় কলি—সঞ্চারী, প্রায়ই খাদে গীত বা বাদিত হয়। সাধারণত মুদারার প্রথম কয়েকটি সুর হইতে আরম্ভ হইয়া উদারার শেষ কয়েকটি সুরে অবরোহণ করে ও পুনরায় আরোহণক্রমে মুদারার 'স'তে বা ইহার নিকটবর্ত্তী সুরে আসিয়া থামে। চতুর্থ কলি—আভোগ, সাধারণত অন্তরার মতই চড়াতে গীত বা বাদিত হয়। গতের বা গীতের অন্তরার শেষে আস্থায়ীতে ফিরিতে হয়। কিন্তু সঞ্চারীর পর আর আস্থায়ীতে ফিরিতে হয় না। একেবারে আভোগ গান বা বাদন করিয়া আস্থায়ী ধরিতে হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি গানের কেবল আস্থায়ী ও অন্তরাই থাকে। সঞ্চারী ও আভোগ থাকে না।

কলির শেষে ।।।। এইরূপ চারিটি ছেদ চিহ্ন থাকে। ইহা আস্থায়ীতে

ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। সঞ্চারীর পর আর আস্থায়ীতে যাইতে হয় না বলিয়া ইহার পর আর এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয় না।

গীতের বা গতের মধ্যে কোন কোন স্থান সময় সময় দুইবার আবৃত্তি করিতে হয় সেই স্থানে { } এইরূপ দুইটি বন্ধনী দিয়া চিহ্নিত করা হয়। যেমন, সঃ রঃ গঃ মঃ { পঃ ধঃ নঃ সঁঃ } এখানে পঃ ধঃ নঃ সঁঃ দুইবার গাহিতে বা বাজাইতে হইবে।

আবার পুনরাবৃত্তির সময় কখনও কখনও কয়েকটি স্বুর বাদ দিয়া যাইতে হয়। তখন সেখানে ( ) এইরূপ বন্ধনীচিহ্ন বসে। যেমন, { সঃ রঃ গঃ পঃ ধঃ (নধঃ পঃ) সঁঃ } এইখানে এইটুকু স্থান দুইবার গাহিতে হইবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার গাহিবার সময় 'ধ' স্বুর পর্য্যন্ত গাহিয়াই একেবারে 'সঁ' স্বুরে যাইতে হইবে।

পুনরাবৃত্তিকালে দ্বিতীয়বার গাহিবার সময় গানে বিচিত্রতা আনিবার জন্য কোন স্থানে স্বরপরিবর্ত্তন করিয়া গীত বা বাদন করিতে হয়। যে যে স্বুর পরিবর্ত্তিত হয় সেই সেই স্বুরের মাথার উপরে [ ] এইরূপ বন্ধনীচিহ্ন দিয়া লিখিত থাকে। যেমন :—

[গোঃ—ঃ—রসঃ রঃ]

{ সঃ রঃ—ঃ—ঃগোঃ—ঃ মঃ মঃ পঃ—ঃ—ঃ—ঃপঃ—ঃ—ঃ—ঃ }

এখানে দ্বিতীয়বার গীত বা বাদন করিবার সময় সঃ রঃ—ঃ গোঃ স্থানে গোঃ—ঃ রসঃ রঃ গীত বা বাদিত হইবে।

আস্থায়ীর যে স্বুর পর্য্যন্ত গাহিয়া অন্তরা ও সঞ্চারী ‖ ধরিতে হইবে সেই স্বুরের উপর ‖ এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়, যেমন— মঃ পঃ ধঃ পঃ । এখানে 'প' স্বুরে আসিয়া থামিতে হইবে। সাধারণত গান বা গতে আস্থায়ীর প্রথম শমের পূর্ব্ব স্বুরটিতে থামিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত যে স্বরলিপির চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাকে বিসর্গমাত্রিক স্বরলিপি বলা হয়। বহু প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞেরা একপ্রকার

দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পরিচয়

স্বরলিপি প্রথা ব্যবহার করিতেন। সেই প্রথা রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে তাহা লোপ পাইয়া যায় এবং গুরুর নিকট মুখে মুখে গীত শিক্ষা চলিয়া আসিতে থাকে। মহারাজা ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীতশিক্ষক সঙ্গীতাচার্য্য ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এক প্রকার স্বরলিপিপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। ইহাকে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি বলা হয়। তখন ভারতের আর কোথাও স্বরলিপি-প্রথা ছিল না। এইজন্য এই প্রথা সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এই প্রথা অনুসারেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার চিহ্নাদির পরিচয় দিতেছি।

সাতটি সুরকে আমরা স, র, গ, ম, প, ধ, ন, লিখিয়াছি। কিন্তু দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে শুদ্ধ সুরকে স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি লেখা হয়।

আমরা কোমল ও কড়ির চিহ্ন ওকার ও ঈ-কার দিয়াছি। কিন্তু দণ্ডমাত্রিক সুরগুলির উপর ত্রিভুজ ও নিশান দিয়া কোমল ও কড়ি সুর বুঝান হয়। যেমন—

△
ঋ = কোমল র

△
গ = ,, গ

△
ধ = ,, ধ

△
নি = ,, ন

।V
ম = কড়ি ম

কাজেই শুদ্ধ ও বিকৃত সুরগুলি এইরূপ ভাবে লিখিত হয়। যথা—

	△		△			।V		△		△		·
স	ঋ	ঋ	গ	গ	ম	ম	প	ধ	ধ	নি	নি	স

তারা সপ্তকের চিহ্ন বিসর্গমাত্রিকপদ্ধতির মত সুরের উপরে বিন্দু ও উদারা সপ্তকের চিহ্ন স্বরগুলির নীচে বিন্দু।

আমরা পূর্ব্বে সুরের পরে বিসর্গ দিয়া মাত্রার চিহ্ন দেখাইয়াছি। বিসর্গ দিয়া মাত্রা দেখান হয় বলিয়া ইহার নাম বিসর্গমাত্রিকপদ্ধতি। আমরা দেখাইয়াছি—

সঃ = স একমাত্রা

সঃ—ঃ = স দুই মাত্রা

কিন্তু দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের উপরে দণ্ড দিয়া মাত্রা দেখান হয় এইজন্য ইহার নাম দণ্ডমাত্রিক হইয়াছে। দণ্ডমাত্রিকে—

।
স = স একমাত্রা

॥
স = স দুইমাত্রা

।।।
স = স তিন মাত্রা

।।।।
স = স চারি মাত্রা

বিসর্গমাত্রিকে সরঃ = স, র, প্রত্যেকটি সুর অর্দ্ধমাত্রা উভয়ে মিলিয়া একমাত্রা।

সরগমঃ = স, র, গ ও ম চারিটি সুর প্রত্যেকটি সিকি মাত্রা, চারিটি মিলিয়া একমাত্রা, এইরূপ দেখান হইয়াছে বিসর্গমাত্রিকে, কিন্তু দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিতে

।
সঋ = স ও র দুই সুর মিলিয়া একমাত্রা

।
সঋগ = স, র, গ, তিনটি সুর মিলিয়া একমাত্রা

সঋগম = স, র, গ ও ম চারিটি স্বুর মিলিয়া একমাত্রা, আবার দণ্ডমাত্রিকে অৰ্দ্ধমাত্রার ও সিকি মাত্রার পৃথক পৃথক চিহ্ন বসে, যেমন—

৺
স = স অৰ্দ্ধমাত্রা

×
স = স সিকিমাত্রা

৺×
স = স বার আনা মাত্রা

।৺
স = স দেড় মাত্রা

বিসর্গমাত্রিক পদ্ধতিতে ভূমিকার চিহ্ন দেওয়া হয় এইরূপ :— সরঃ কিন্তু দণ্ডমাত্রিকপদ্ধতিতে সঋ লিখা হয়।

দণ্ডমাত্রিকপদ্ধতিতে আশের চিহ্ন স্বুরের নীচে সরল লেখা ———

মীড়ের চিহ্ন স্বুরের নীচে দুইটি সরল রেখা ═══

গিট্‌কারীর চিহ্ন এইরূপ— - - - - -

দণ্ডমাত্রিক তালবিভাগের পর ছেদ । চিহ্ন দেওয়া হয়। কিন্তু আওয়ার্দ্দার পরে আর কোন বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হয় না। ॥ এইরূপ দুইটি ছেদচিহ্ন দিয়া আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসিবার চিহ্ন দেখান হয়। আর বাকী চিহ্নগুলি বিসর্গমাত্রিক পদ্ধতির ন্যায়।

এখানে স্বরলিপি কিস্তিবন্দী করিয়া দিতেছি।

(১) স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি সাতটি শুদ্ধ স্বুর।

(২) △
ঋ = কোমল র

△
গ = কোমল গ

।V
ম = কড়ি ম

△
ধ = কোমল ধ

△
নি = কোমল ন

(৩) তারা সপ্তকের সুরগুলির উপরে বিন্দু ও উদারা সপ্তকের সুরগুলির নীচে বিন্দু। যথা ঃ—

স ঋ গ ম প ধ নি স ঋ গ ম প ধ নি স ঋ গ ম প ধ নি

উদারা মুদ তারা

(৪) । স = স এক মাত্রা

॥ স = স দুই মাত্রা

।।। স = স তিন মাত্রা

।।।। স = স চারি মাত্রা

৺ স = স অর্দ্ধ মাত্রা

× স = স সিকিমাত্রা

সঋ = স ও র উভয়ে মিলিয়া একমাত্রা

। সঋগ = স, র ও গ তিন সুর মিলিয়া এক মাত্রা

(৫) আশের চিহ্ন সুরের নীচে একটি সরল রেখা ——

মীড়ের চিহ্ন সুরের নীচে দুইটি সরল রেখা ═══

গিট্‌কারীর চিহ্ন সুরের নীচে এইরূপ - - - - - - - -

ভূমিকার চিহ্ন— সঋ

(৬) তালের পদবিভাগের পর ছেদ । চিহ্ন, আর দুইটি ॥ ছেদ চিহ্ন আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসার চিহ্ন। শমের চিহ্ন + ফাঁক = ০, ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দিয়া তালি বুঝান হয়।

দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজী স্বরলিপির সাহায্যে ভারতীয় গীত-স্বরলিপি করেন। এই দেশে ইংরেজী স্বরলিপি অনুযায়ী পুস্তক মুদ্রিত করিতে অত্যন্ত খরচ পড়ে বলিয়া তাহার প্রচলন আর নাই।

আকার-মাত্রিক স্বরলিপির পরিচয়

দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি হইতে আরও সরল এক প্রকার স্বরলিপিপদ্ধতি সঙ্গীতাচার্য্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রবর্ত্তন করেন। তাহাই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই আজকাল বেশী প্রচলিত।

আকারমাত্রিক স্বরলিপির সঙ্গে বিসর্গমাত্রিক স্বরলিপির মাত্রায় কয়েকটি চিহ্নের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে বিকৃত স্বরগুলির চিহ্ন এইরূপ দেওয়া আছে :—

ঋ = কোমল র   জ্ঞ = কোমল গ   হ্ম = কড়ি ম

দ = কোমল ধ   ণ = কোমল ন

আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে বারটি স্বর নিম্নলিখিত ভাবে স্থাপিত। যথা :—

স ঋ র জ্ঞ গ ম হ্ম প দ ধ ণ ন র্স

আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে উদারার চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত (্) ও তারের চিহ্ন স্বরের উপরে রেফ (´), যথা :—

স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্	স র গ ম প ধ ন	র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ধ র্ন
উদারা	মুদারা	তারা

বিসর্গমাত্রিকে সঃ = স এক মাত্রা আকারমাত্রিকে সা = স এক মাত্রা
বিসর্গমাত্রিকে সঃ--ঃ = স দুই মাত্রা আকারমাত্রিকে সা—া = স দুই মাত্রা

বিসর্গমাত্রিক পদ্ধতিতে যেখানে বিসর্গ বসে, আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে আকার বসে। মাত্রার চিহ্ন আকার ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম আকারমাত্রিক পদ্ধতি হইয়াছে।

আকারমাত্রিকে সরা = স ও র উভয়ের মিলিয়া একমাত্রা

সরগা = স, র, গ, তিন স্বর মিলিয়া একমাত্রা

আবার আকারমাত্রিকে অর্দ্ধমাত্রার পৃথক চিহ্নও আছে। বিসর্গ দিয়া অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন—সঃ রঃ = স ও র উভয়ে এক মাত্রা।

তালের প্রতিপদে ছেদ I দেওয়া হয়। তালের এক আওয়ার্দা পূর্ণ হইলে I এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়। আর আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসিতে এইরূপ II যুগল চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ঐ পদ্ধতিতে প্রত্যেক চরণের স্বরলিপি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ II যুগল চিহ্ন বসে। আভোগের প্রথমে এরূপ চিহ্ন বসে না। আর আভোগের পরে IIII এইরূপ চারিটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে তালির চিহ্ন ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি দেওয়া হয়। ফাক = ০, আর যে তালির উপরে শম্ পড়িবে সেই সংখ্যার উপরে রেফ দিয়া শম্ বুঝান হয়। যেমন :--- ০ ১ ২́ ৩। এখানে দ্বিতীয় তালে শম্ পড়িবে। আর বাকী অন্যান্য চিহ্নগুলি বিসর্গমাত্রিক পদ্ধতির ন্যায়।

এখানে আকারমাত্রিক স্বরলিপি কিস্তিবন্দী করিয়া দিতেছি।

(১) স, র, গ, ম, প, ধ, ন সাতটি শুদ্ধ স্বর।

(২) ঋ = কোমল র
জ্ঞ = কোমল গ
হ্ম = কড়ি ম
দ = কোমল ধ
ণ = কোমল ন

(৩) স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্ স র গ ম প ধ ন র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ধ র্ন

উদারা	মুদারা	তারা
স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্	স র গ ম প ধ ন	র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ধ র্ন

(৪) সা = স এক মাত্রা

সা-া = স দুই মাত্রা

সা-া-া = স তিন মাত্রা

সঃ = স অৰ্দ্ধ মাত্রা

সাঃ = স দেড় মাত্রা

সরা = স ও র উভয়ে মিলিয়া এক মাত্রা

সরগা = স, র, গ তিন সুর মিলিয়া এক মাত্রা

(৫) ভূষিকার চিহ্ন সরা

মীড়ের চিহ্ন ‿

গিট্‌কারীর চিহ্ন সুরের নীচে সরল রেখা —

আশের চিহ্ন সুরের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট হাইফেন। যথা :— সা-রা-গা-মা-

(৬) তালের পদবিভাগের চিহ্ন ছেদ | , প্রতি আওয়ার্দার পরের চিহ্ন I, আস্থায়ীতে ফিরিবার চিহ্ন II

প্রত্যেক কলি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে II চিহ্ন দেওয়া হয় ও আভোগের শেষে IIII এইরূপ চারিটি চিহ্ন দেওয়া হয়।

ফাঁক = ০ ; শম্ = ১´, ২´ ইত্যাদি ; ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি তালি বুঝান হয়।

বিসর্গমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্গমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। এখানে ফিস্তিবন্দী করিয়া তাহা লিখিয়া দিতেছি।

(১) স র গ ম প ধ ন সাতটি শুদ্ধ সুর।

(২) রো = কোমল র
গো = কোমল গ
মী = কড়ি ম
ধো = কোমল ধ
নো = কোমল ন

(৩) স র গ ম প ধ ন — উদারা; স র গ ম প ধ ন — মুদারা; স র গ ম প ধ ন — তারা

(৪) সঃ = স এক মাত্রা সঃ-ঃ = স দুই মাত্রা

সঃ-ঃ-ঃ = স তিন মাত্রা

সরঃ = স ও র প্রত্যেকটি সুর অর্দ্ধমাত্রা, উভয়ে মিলিয়া এক মাত্রা।

সরগঃ = স, র, গ তিনটি সুর মিলিয়া একমাত্রা

সরগমঃ = স, র, গ ও ম চারিটি সুর মিলিয়া এক মাত্রা ও প্রত্যেকটি সুর সিকি মাত্রা।

(৫) ভূষিকা ছোট অক্ষরে লেখা হয় = সরঃ

আশের চিহ্ন সুরের নীচে একটি সরলরেখা ——

গিটকারীর চিহ্ন সুরের নীচে দুইটি সরলরেখা ══

মীড়ের চিহ্ন সুরের নীচে ‿ বক্ররেখা

(৬) তালের পদবিভাগ ছেদ । চিহ্ন। প্রতি আওয়ার্দার পরে দুইটি ॥ ছেদ চিহ্ন। চারিটি ।।।। ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিবার চিহ্ন।

শম্ = + ; ফাঁক = 0 ; ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক দিয়া তালি বুঝান হয়।

(৭) পুনরুক্তির চিহ্ন { }, পুনরুক্তিকালে কয়েকটি সুর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ); পুনরুক্তিকালে পরিবর্ত্তিত সুর স্থাপনের চিহ্ন [ ]

(৮) আস্থায়ীতে যে সুরে আসিয়া থামিতে হয়, সেই সুরের মাথায় যুগল ॥ ছেদ বসে।

রাগরাগিণী স্বরবিন্যাসকে তালে গীত বা বাদন করার নাম সারগম্। সারগমের স্বরগুলিকে সা, রে, গা, মা প্রভৃতি দিয়াই উচ্চারণ করিতে হয়, সারগমকে সরগম বা সরিগমও বলা হয়। সারগম

রাগরাগিণী সহজে কণ্ঠে চিনিয়া লইতে প্রথম শিক্ষার্থীর সারগম শিক্ষা করা একটি প্রধান উপায়। ইহাতে কণ্ঠের জড়তাও নষ্ট হয়; রাগরাগিণীর রূপও শিক্ষা হয়; আবার তালের জ্ঞানও জন্মে।

নীচে একটি সারগম তিনপ্রকার স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারেই গঠন করিয়া দিতেছি। প্রথম শিক্ষার্থীদের স্বরলিপি পদ্ধতিগুলি চিনিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আস্থায়ী

```
•        ·     ১             +          ৩
।   ।.   ।△    ।    ॥    ।    ।।।   ।    ।    ।    ॥
প   স    ন  |  ধ    প    ম  | গ    ম  | গ    র    স  |

•                ১              +              ৩
।  ।  ।  ।       ।  ।  ।  ।.    ।  ।.  ।  ।.   ।.  ।△  ॥
স  ম  গ  ম   |   প  ধ  ন  স  |  ন  স  ন  র  |  স   ন   ধ  |

•          ১ .            +              ৩
।.  .।।।   ।.  ।.  .।  .।   ।  .।  ।  .।   ।  ।△  ।  ।
স   গ   |  ম   গ   র   স  | ন  স   ন  র  | স  ন   ধ  ম  ||
```

অন্তরা

```
•            ১             +               ৩
॥   ।   ।  |  .।   ।   .॥  |  ।.  ।  ।.  ।.  |  ।.  ।△  ॥
ম   ধ   ন  |  স    ন   স   |  স   ন  স   র   |  স   ন   ধ  |

•                   ১        +             ৩
.।  .।  .।  .।      .॥  .॥    ।  .।  ।  .।   .।  ।△  ।  ।
স   ম   গ   ম   |   র   স  |  ন  স   ন  র  |  স   ন   ধ  পধ  |
```

০ ১ + ৩
। ।।△ । । .। । .। ।। । । । । ।।
ম ন ধ | ন স ন স | ম প ধ | প ম গ

০ ১ + ৩
।। । । ।। । । .। । .। .। .। ।△ । ।
স গ ম | প ন ন | স ন স র | স ন ধ ম

আকারমাত্রিক পদ্ধতি

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩
II পা র্সা -া ণা | ধা পা -া মা | গা -া -া মা | গা রা সা -া I

০ ১ ২´
সা মা গা মা | পা ধা না র্সা | না র্সা না র্রা | র্সা ণা ধা -া I

০ ১
র্সা র্গা র্গা র্গা | র্মা র্গা র্রা র্সা | না র্সা না র্রা | র্সা ণা ধা মা II

অন্তরা

০ ১ ২´ ৩
II মা -া ধা না | র্সা না র্সা -া | র্সা না র্সা র্রা | র্সা ণা ধা -া I

০ ১ ২´ ৩
র্সা র্মা র্গা র্মা | র্রা া র্সা -া | না র্সা না র্রা | র্সা ণা ধা পধা I

০ ১ ২´ ২
মা ণা -া ধা | না র্সা না র্সা | মা -া পা ধা | পা মা গা -া I
সা -া গা মা | পা -া না না | র্সা না র্সা র্রা | র্সা ণা ধা মা II II

বিসর্গমাত্রিক পদ্ধতি

আস্থায়ী

০ ০ ১ + ৩
পঃ র্সঃ—ঃ ণোঃ | ধঃ পঃ—ঃ মঃ | গঃ—ঃ—ঃ মঃ | গঃ রঃ সঃ—ঃ I

০ ১ ০+ ০ ০ ০৩
সঃ মঃ গঃ মঃ | পঃ ধঃ নঃ র্সঃ | নঃ র্সঃ নঃ র্রঃ | র্সঃ ণোঃ ধঃ—ঃ II

সঃ গঃ গঃ গঃ | মঃ গঃ রঃ স | নঃ সঃ নঃ রঃ | সঃ নোঃ ধঃ মঃ II II

অন্তরা

মঃ—ঃ ধঃ নঃ | সঃ নঃ সঃ—ঃ | সঃ নঃ সঃ রঃ | সঃ নোঃ ধঃ—ঃ—II

সঃ মঃ গঃ মঃ | রঃ—ঃ সঃ—ঃ | নঃ সঃ নঃ রঃ | সঃ নোঃ ধঃ পধঃ II

মঃ নোঃ—ঃ ধঃ | নঃ সঃ নঃ সঃ | মঃ—ঃ পঃ ধঃ | পঃ মঃ গঃ—ঃ II

সঃ—ঃ গঃ মঃ | পঃ—ঃ নঃ নঃ | সঃ নঃ সঃ রঃ | সঃ নোঃ ধঃ মঃ II II

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া তদনুযায়ী অভ্যাস করিলে যে-কোন প্রকার স্বরলিপি দেখিয়া গীত বা গৎ শিক্ষা করা যাইবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

'গীত-উপক্রমণিকা' সম্বন্ধে কতিপয় সঙ্গীতাচার্য্যের অভিমত—

"'সঙ্গীতচন্দ্রিকা', 'তানমালা', 'সঙ্গীতলহরী' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগ্রন্থ-প্রণেতা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর-সরস্বতী মহাশয় ২২।৬।৩১ ইং তারিখে জানাইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন শর্ম্মা প্রণীত "গীত উপক্রমণিকা" সম্বন্ধে আমার মন্তব্য—

আজকাল যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চ্চা করেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয় অর্থাৎ তাহার উপক্রমণিকা আলোচনা করেন। উচ্চ সঙ্গীত অর্থাৎ ধ্রুপদ, খ্যাল, প্রভৃতি চর্চ্চা করিতে হইলে সঙ্গীতশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করা ও সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করা প্রয়োজন। কিন্তু এ সাধনার পথে অতি অল্প ব্যক্তিই অগ্রসর হন। শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন যখন সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয় লিখিতে আরম্ভ করেন তখন আমি অতিশয় আনন্দিত হই। তাঁহার লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি আমি 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' হইতে কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। উচ্চ সঙ্গীতবিষয়ক প্রচলিত নানাবিধ গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া তাহার ঔপপত্তিক বিষয়গুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তিনি সঙ্গীতরসজ্ঞ ও শিক্ষার্থিগণের একটি অভাব মোচন করিলেন।

উচ্চ সঙ্গীতের প্রকৃত সাধনার নিমিত্তই সঙ্গীতশাস্ত্রের সৃষ্টি। নিকৃষ্ট রুচিসম্মত সাধারণ গানে ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ শাস্ত্রালোচনায় যাঁহারা ব্রতী হন্ তাঁহারাই সঙ্গীতের প্রকৃত সাধক।

সঙ্গীতের উপক্রমণিকার ব্যাখ্যা এবং নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন শর্ম্মা মহাশয় সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

'গীত-উপক্রমণিকা'র বহুল প্রচার হোক ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাক্ষর) শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট "সরল সঙ্গীতও হারমোনিয়ম শিক্ষক" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় ২৯।৫।২৯ ইং তারিখে জানাইয়াছেন—

"গীত-উপক্রমণিকা" পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থখানার ভাষা সহজ ও সরস এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি গ্রন্থকার বেশ সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেইজন্য এবং প্রচলিত সকল প্রকার স্বরলিপি পদ্ধতির বিশদ পরিচয় এই গ্রন্থে থাকায় প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার

২৯।৫।২৯ ইং

প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, সঙ্গীতরত্ন (ভারত শ্রীধর্ম্ম মহামণ্ডল, কাশী) মহাশয় ১৩।৩.৩৬ বাং তারিখে জানাইয়াছেন—

'গীত-উপক্রমণিকা' গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। সাধারণ সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা ইহার ভাষা সরল ও ভাব সহজবোধ্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক দুষ্প্রাপ্য। ইহা যে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য

১৩।৩।১৩৩৬ বাং